অধ্যায় - ০১

ভারতীয়-সমাজে নারীর অবস্থান

ভারতীয় সমাজ কেন বিশ্বের সব সমাজ-ব্যবস্থায় ছিল নারী-পুরুষের বৈষম্য। এই বৈষম্য বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মত ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেও ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে বঙ্গ-কবিকূলের হস্তক্ষেপে একেরপর এক কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে নারী-কূলের যন্ত্রণার ধ্বনি শুনতে পাই। সেই প্রাচীন-সাহিত্য থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের যে দিকেই নজর দি-ই না কেন, নারীর আর্তনাদ আমাদের ব্যথিত করে তোলে। ব্যথিত হৃদয়-মন খুঁজতে বসে, সেই নারীর আর্তনাদ ছাড়া আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদকেও। বহু শতাব্দী-পথ পেরিয়ে এসে কবিদের কণ্ঠে নারী পুরুষের বৈষম্যকে অস্বীকার করে উচ্চারিত হল-

''সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।''[১]

মানব-সভ্যতা-বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে, নারী পুরুষের বৈষম্য চলে আসছে মানব সমাজের একেবারে আদিম যুগের পরবর্তী সময় থেকেই। এই বিভিন্ন স্তরে আমরা দেখি এই বৈষম্য কখনো নগ্ন, কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো নমনীয় এবং কখনো এতটাই কদর্য যে, তা ভাবতে বসলে আঁতকে উঠতে হয়। প্রাচীন যুগ থেকে আজ-অব্দি পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থা ধরেই নিয়েছে যে, নারী পুরুষের মধ্যে এই যে বৈষম্যের ব্যবধান, এই যে পুরুষের প্রাধান্য এবং নারীর এই যে বশ্যতা এ যেন শাশ্বত, বিধির বিধান, চিরকালই ছিল, এখনো আছে আর অনাগত ভবিষ্যতেও চলবে বা থাকবে। এই রকমের একটা পূর্ব নির্ধারিত স্থির সিদ্ধান্ত চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। আর তাই শুধু আমাদের দেশ নয় সকল দেশের মানুষ এই অবস্থাকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছে সভ্যতা-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে।

> ''তারই প্রতিফলন পড়েছে মানুষের মনে, ধ্যান-ধারণায়, চিন্তা-ভাবনায়, আবেগ-অনুভূতিতে, শিল্প-সাহিত্যে, কাব্য-সঙ্গীতে-সর্বত্রই। সমাজে নারীজাতির বৈষম্য-মূলক অবস্থানের প্রতিফলন পড়েছে সমাজমানসে, প্রতিফলন পড়েছে ব্যক্তিমানসেও।''[২]

মানব সমাজের জন্মলগ্ন থেকেই নারী পুরুষের চেয়ে হীন অবস্থায় ছিল, ছিল পরাধীন। সারা বিশ্বের চারটি মহাকাব্যের দুটিই ভারতবর্ষের- ক) রামায়ণ, খ) মহাভারত। এই মহাকাব্যের ভারতবর্ষের নারীর যে অবস্থান তা স্বল্প কথায় বলা দুষ্কর।

০১ ভারতীয়-সমাজে নারীর অবস্থান

আমরা প্রায় সব সময় শুনতে পাই, পুরাণ, বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, কোরান, তৌরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ নাকি বিজ্ঞান-মনস্ক; সব-ই নাকি এই বিশ্ব-সংসারের তথা মানব জাতির কল্যাণে রচিত। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে আর বাস্তবের ভূ-মন্ডলে দাঁড়ালে একেবারে উল্টো চিত্র নজরে আসে। প্রতিটি ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা নির্লজ্জভাবে মনে করেন, একমাত্র তাঁদের ধর্ম-ই নাকি সাম্যবাদী, তাঁদের ধর্মই সবচেয়ে বড় সহিষ্ণু প্রদর্শন করে, মানবতা আর ন্যায় বিচারের শিক্ষা দেয়। তবে ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন সাক্ষ্য দেয় জগতে ধর্মের নামে-ই যত অন্যায়, অবিচার, রাহাজানি, নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতা, জঘন্যতা, রক্তপাত, নিপীড়ন, শোষণ, উৎপীড়ন, অবদমন, অধিকারহরণ, বঞ্চনা, জাতিনির্যাতন, গোষ্ঠিনির্যাতন, নারীনির্যাতন, শিশুনির্যাতন, শ্রমশোষণ, যৌনশোষণ ইত্যাদি যেভাবে সংঘটিত হয়েছে- আর কোন কিছুর কারনে এরূপ অমানুষিক বিবেকহীন ক্রিয়াকলাপ বিশ্বের কোন দেশে এভাবে সংঘটিত হয়নি। হিন্দুরা মুসলমানের ‘খোদা-তাল্লা-আল্লাহ’কে ভালোবাসার কোন কারণ নেই, তেমনি মুসলমানেরা হিন্দুর ‘দেব-দেবী-ভগবান’-কে কিংবা খ্রীস্টানদের ‘গড’কে ভালোবাসতে পারে না। আসলে ধর্মগ্রন্থসমূহে আমরা ভগবান, আল্লাহ, গডের যে স্বরূপ দেখতে পাই তাতে তিনজনকেই নিষ্ঠুর ঘাতক বলেই চিহ্নিত করতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মানুসারীরা একে-অপরকে উৎখাত করার জন্য তুলকালাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এও ঠিক আজো প্রত্যেকেই নিজ স্বীয়-বলে স্বীয় ধর্মে টিকে আছেন। একে অন্যের ক্ষমতাকে জাহির করার জন্য প্রায় প্রতি বছর-ই দেখতে পাই পৃথিবীর নানাস্থানে ভাঙছে মন্দির-মসজিদ-গীর্জা। ভাঙছে বৌদ্ধমূর্তি। আবার দেখা যাচ্ছে যাত্রী ভর্তি উড়োজাহাজ নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে টুইন টাওয়ারে, ম্লেচ্ছ নিধন করছে গুজরাটে। ধর্মের বাড়বাড়ন্তের জন্য এবং মানব ইতিহাসের কলঙ্কের জন্য আজো চিহ্নিত হয়ে আছে মধ্যযুগ। সেখানে ক্রুসেডে নিহত হয়েছেন অগণিত খ্রীস্টান, মুসলমান, হিন্দু। ইউরোপে ‘ভূতগ্রস্ত’ সহস্র-সহস্র নর-নারী এবং শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের ৭নং ঋকসহ আরো নানা ধর্মীয় গ্রন্থের শ্লোকের উপর ভিত্তি করে সতীদাহ, সহমরণের মত অমানবিক প্রথায় হাজার হাজার নিরাপরাধ নারীর বলিদান হয়েছে চিতাগ্নিতে। কৌলিন্য, বিধবা প্রথার কল্যাণে অগণিত অল্প-বয়সী, যুবতী নারীরা দলে দলে ভীড় জমিয়েছে পতিতালয়ে, বাধ্য হয়ে করেছেন আত্মহত্যা, দিয়েছেন আত্ম বলিদান।

যেকোন দেশ বা কালের সমাজব্যবস্থা কতটা উন্নত, কতটা মানবিক, আর কতটুকু বা গণতান্ত্রিক তা পরিমাপ করতে গেলে প্রথমেই আমরা নজর দিয়ে থাকি উৎপাদক আর উৎপাদনের দিকে, শাসক-শোষিতের দিকে, শোষিত, আশাহত, পীড়িত-উৎপীড়িত, অপাংক্তেয় মানুষের ভীড়ে যারা হারিয়ে যাবার উপক্রমে রয়েছে, যারা দারিদ্র-সীমারেখার তলানীতে উপনীত তাদের জীবনমানকে নিয়ে

আলোচনা করি। কিন্তু অতীতে দেখা গেছে সেই সমাজের নারীদের নিয়ে আ-মরি আলোচনায় কোন সমালোচক, প্রাবন্ধিক, ধর্মান্ধ ব্যক্তি- যা-ই বলি না কেন কেউ-ই নারীদের নিয়ে মাথা-ব্যথা করেনি। তবে যে কোন দেশের দেশ-কাল-সমাজকে জানতে হলে উপরি-উক্ত সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সেই সমাজে, সমাজব্যবস্থায় বা কালের গতিধারায় নারীর অবস্থান কোথায়, সমাজের কর্ণধার-সমাজপতিরা তাদের কোন নজরে দেখছেন ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয় না নিয়ে আসলে, কোন মতেই তাকে আমার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অভিধায় ভূষিত করতে পারি না। সমাজ ব্যবস্থা কতটা মানব-মুখী ছিল তাও বোঝা দুস্কর হয়ে পড়ে। পুরুষের সৃষ্ট, পুরুষ-কতৃক শাসিত ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষেরা অবাধে নারীভোগ করে চলেছে। এই বিশ্বের সমস্ত দেশ, সমস্ত ধর্ম নারীকে 'মানুষ' বলে গণ্য করেনি, করেছে ভোগ্যপণ্য হিসেবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়, পুরুষের দৃষ্টিতে নারী সামাজিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে দুর্বল, অক্ষম, অপরিপক্ক, বুদ্ধিহীন, অসংযত। তাই এ নারীর দেহর-ই মালিক শুধু স্বামী নয়, স্ত্রীর উপার্জিত টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত এমন কি বিয়ের সময় পিতা-আত্মীয়-স্বজন যে সমস্ত দান-সামগ্রী দান দিয়েছে দু'জনকে; তার সমস্ত কিছুর মালিক স্বামী। এও ঠিক আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে শুনে আসছি, যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সমস্ত ধর্মের ধর্মগ্রন্থ গুলো হল ঈশ্বরের তথা ভগবানের-আল্লাহের-গডের বাণী। শুধু শুনে আসাতেই ক্ষান্ত হন না সমস্ত ধর্মের ভন্ডধারীরা, তারা সমস্ত পিতৃকুল-মাতৃকুলের সকলকে এমনভাবে ধর্মীয় গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে যে ঐ বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকাল থেকে বুঝিয়ে সুজিয়ে মস্তিকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় যে যার যার ধর্ম তা অন্যান্য সমস্ত ধর্ম থেকে আলাদা, সাম্যবাদী, মহান। আর ঈশ্বর-ই নারী-পুরুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছে। আমাদের ভারতে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক।

হিন্দুরা মনুকে মানেন ভগবান, হিন্দু-আইনের ভিত্তিভূমি। মনুসংহিতা ভগবানের মর্যাদা পেয়েছে এই 'মনুসংহিতা'। এই 'মনুসংহিতা'কে চতুর ব্রাহ্মণেরা বলেন মানবশাস্ত্র। এই মানবশাস্ত্রে নারী সম্বন্ধে ভগবান মনু বলেন-

''নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।

সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে।।''[৩] (৯/১৪)

বঙ্গানুবাদ: স্ত্রীরা রূপ বিচার করে না, (যৌবনাদি) বয়সে এদের আদর নেই, রূপবান বা কুরূপ পুরুষ মাত্রেই সম্ভোগ করতে চায়। এরপর মনু বলেন-

''ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।

ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্বদেহিনাম্।।''[৪] (৯/৩৩)

বঙ্গানুবাদ: নারী শস্যক্ষেত্রের মতো, আর পুরুষ শস্যের বীজস্বরূপ। এই ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে সকল প্রাণীর উৎপত্তি।

''বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।

সর্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা।।'' [৫] (৯/৩৫)

বঙ্গানুবাদ: বীজ ও যোনি এই দুটির মধ্যে বীজই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়। কারণ, সর্বত্র সন্তান বীজের লক্ষণ যুক্ত হয়ে থাকে। মনু বলেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে-

''বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।

উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।।''[৬] (৫/১৫৪)

বঙ্গানুবাদ: পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা গুণহীন হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য। স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে ব্যভিচারিণী হলে সংসার নিন্দনীয় হয়, শৃগালের জন্মপ্রাপ্ত হয় এবং যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি নানা পাপরোগে আক্রান্ত হয়। স্ত্রীর আগে স্বামী যদি মারা যায় তাহলে মনুর কথায় ''স্ত্রী বরং পবিত্র ফল, মূল, ফুল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, তথাপি পতি মৃত হলে অন্যের নামোচ্চারণ করবেন না।''[৭] (৫/১৫৭)

নারী একটা নিকৃষ্ট কামজ সত্তা ছাড়া আর কিছুই নয়-

''স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ্ দূষণম্।

অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।।''[৮] (২/২১৩)

অনুবাদ করলে দাড়ায়, ইহলোকে পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব; এই কারণে পন্ডিতেরা স্ত্রীলোকসম্বন্ধে কখোনই অনবধান হন না। শাস্ত্র আবার এও বলে দিয়েছে মা, বোন বা কন্যার সাথে কোনো পুরুষ নির্জন গৃহাদিতে বাস করবে না, কারণ ইন্দ্রিয় সমূহ এতই চঞ্চল যে, এরা বিদ্বান ব্যক্তিকেও কামক্রোধাদির দ্বারা আকর্ষণ করে।

''মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা না বিবিক্তাসনো ভবেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।''[৯] (২/২১৫)

মনুশাস্ত্রে নারী-স্বাধীনতাকে কোনভাবেই স্বীকার করা হয়নি-

''বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।

ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষবপি।''[১০] (৫/১৪৭)

অর্থাৎ স্ত্রীলোক বালিকা, যুবতী কিংবা বৃদ্ধাই হোক, সে গৃহমধ্যে থেকে কোনো কাজ স্বামীর প্রমুখের বিনা অনুমতিতে করতে পারবে না।

স্ত্রীলোক কখনো পিতা, স্বামী কিংবা পুত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; কারণ, স্ত্রীলোক এদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে পিতৃকুল এবং পতিকুল- উভয় কুলকেই কলঙ্কিত করে তোলে-

''পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্যাদুভে কুলে।।''[১১] (৫/১৪৯)

এমন অনেকে আছেন যাঁরা পবিত্র ধর্মগ্রন্থে নারী-পুরুষের সমতা খুঁজে বেড়ান, তাঁরা যে কী খুঁজেন তা বলা দায়। মনুশাস্ত্রে স্ত্রীকে প্রহার শুধু নয় কোথায় প্রহার করতে হবে তারও নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

''পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।
অতোহন্যথা তু প্রহরন্ প্রাপ্ত স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্।।''[১২] (৮/৩০০)

বঙ্গানুবাদ করলে - রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা প্রহার যদি করতে হয়, তাহলে শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগে প্রহার কর্তব্য; কখনো উত্তমাঙ্গে বা মাথায় যেন প্রহার করা না হয়; এই ব্যবস্থার অন্যথা করে অন্যত্র প্রহার করলে প্রহারকারী চোরের মতো অপরাধী ও দন্ডনীয় হবে।

বৈদিক সাহিত্যে নারীর অবস্থান পূর্ণ মানুষের নয়। বৈদিক সমাজ তো সর্বসুখময়, আদর্শ, নিষ্পাপ সমাজের কল্পরূপ। বেদের রচনাকাল নিয়ে নানামুনির তর্কজালে প্রবেশ না করে সর্বজন স্বীকৃত না হলেও ধরে নেওয়া যায়- চারিবেদের প্রথম বেদ ঋকবেদ। এর রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে। আর তিনটি হল সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ঋকবেদ বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। এর রচনাকাল কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রথম দিকের স্তরে নারী অনেকাংশে স্বাধীনচারী। যেমন-

> ''অগ্নি তেমনি পবিত্র যেমন পবিত্র স্বামীর দ্বারা সম্মানিত বধূ।' (১/৭৩/৩) দেখা যাচ্ছে, দেবতার আনন্দ, দেবতার পবিত্রতার উপমান মানবের প্রেম মানবীর শুচিতা। এই যুগেই শুনি নারী নিজেই তার জীবনসঙ্গী বেছে নেয়। (স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ, ১০/২৭/১২)।''[১৩]

এও ঠিক ঋগ্বেদে নারী হরণের কথাও আছে। পুরুষের বহুবিবাহ ঋগ্বেদে প্রচলিত। এর জন্য নারীর সপত্নী যন্ত্রনার কথা পাই এখানে। এমনকি দেখি নারী বারবার দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, সপত্নীকন্টক থেকে উদ্ধার পাবার আশায়। যে সমাজ ব্যবস্থায় 'পতিব্রতা'কে সপত্নীদের সাথে জীবনযাপন করতে হয় তাকে কোন ভাবেই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বলা যায় না। এই সময়েই তৈরী হয়ে যায় যে নারীকে স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত হতে হবে। শাস্ত্রকারগণ এই শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান দিয়ে

যান। এটা তো আমরা জানি যে অন্যের দ্বারা ভরণীয়া বলে পত্নীকে বলা হয় ভার্যা। ভৃত্য এবং ভার্যা শব্দের অর্থ দুটি একই- অর্থাৎ ভরণীয়। পুরুষ বহুপত্নীক হয়ে উঠলে নারীর বেলা সে স্বাধীনতা নিষিদ্ধ। আসলে নারী ঋগ্বেদীয় সময় থেকেই ক্রীতদাসীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল। কিন্তু অথর্ববেদে 'সহমরণ' প্রথার উল্লেখ রয়েছে। ''ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা মি পদ্যতে উপত্বা মর্ত্য প্রেতম।''- (অথর্ববেদ-১৮/৩/১) অর্থাৎ- এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এই প্রাচীন রীত অনুসরণ করেছে। তাই তো নারীর প্রার্থনায় শুনি -''যেন ইন্দ্রানীর মতো অবিধবা হই।'' (তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ-৩/৭/৫/৫১)- এরই জন্য বলতে বাধ্য হতে হয় যে তৎকালীন কোন পুরুষ কী কখনো বলেছেন- ''যেন বিপত্নীক না হই''[১৪]- এটা পুরুষের রুচিতে বাধে বোধ হয়।

আবার এও ঠিক ভগবান মনু তিনি তো নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন বিশেষ একটি শর্ত। শর্তটি (৯:১৭৬) হল স্বামীর মৃত্যুকালে যদি নারীর যোনি থাকে অক্ষত, তবেই নারী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে। এটি কি সম্ভব! সুচতুর ভগবান মনুর ভাবনটা ছিল এই রকম যে যদি ঐ নারীর কোন নপুংসক পুরুষের সাথে বিয়ে হয়, বা বাগ্‌দত্তার কন্যার পতি মৃত হয়, অথবা বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী মারা যান, বা মৃত্যু-পথ যাত্রী কিংবা মরা পুরুষের সাথে বিয়ে হয়। কিন্তু এই সামান্য সুখটুকুও বিধবাদের কপাল থেকে মুছে দিলেন পরাশর মুনি। পরাশর সংহিতায় বলে দিলেন অশ্বমেধ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস অবলম্বন, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন এই পাঁচটি আইন কলিকালে বর্জনীয়।

প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সাহিত্যে নারীর হীনদশা সর্বাংশে সত্য। নারীকে ভোগের ব্যাপারে পুরুষের যখন যেভাবে মনে হবে সেভাবে ভোগ করবে। এমনকি সঙ্গমাসন কেমন হবে তাও নির্ধারণের ভার পুরুষের, সেখানে নারীর পছন্দ অমার্জনীয় পাপ ছাড়া কিছু নয়। পুরুষের বেলায় তার লিঙ্গ সর্বদা জীবন্ত-সক্রিয় আর নারীর বেলায় তার যোনি প্রাণহীন আবাদভূমি। তাকে চাষী-পুরুষ যেমন খুশি, যখন-তখন ইচ্ছেমত চাষ করবে। আক্ষেপ থেকে গেল, বলা হল না অনেক কথা, শুধু বলি প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সাহিত্যে নারী বিষয়ে যে শিক্ষা অর্জন করলাম, তা থেকে বলতে হয় নারী পুরুষের উপভোগ্য সম্পদ।

পুরাণে নারী: প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমাদের ভারতীয় নারীর যে করুণ অবস্থা তা খুঁজে পেতে দেরি হয় না। প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থান নিয়ে আজও বিতর্কের অন্ত নেই। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে বৈদিক যুগে নারীর স্থান ছিল উপরে। পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ-শাসিত সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম নিলেও তার যত্নে কোন ত্রুটি রাখতেন না সে সময়কার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তথা সমাজ। তার শিক্ষার দিকে পিতা-মাতা যথেষ্ট যত্নবান হতেন। বৈদিক

যুগে আমরা ব্রহ্মবাদিনীদের কথা জানি। তাঁদের মধ্যে অনেকে ঋগ্বেদের কিছু সুক্ত বা শ্লোক রচনা করেছেন। যেমন ঘোষ, অপালা, বিশ্ববারা। উপনিষদের যুগে গার্গীর মতো দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পন্ডিতের সঙ্গে বির্তকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উচ্চবর্ণের রমণীরা তাঁদের স্বামীর সঙ্গে যাগযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর ইচ্ছা করলে পুনরায় বিবাহ করতে পারতেন। তবে এও ঠিক

> ''কিন্তু এটাকে যে তখনও ভালো চোখে দেখা হত না তার প্রমাণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের উপাখ্যান। জনক রাজার সভায় যাজ্ঞবল্ক্য যখন গার্গীর সঙ্গে দার্শনিক বির্তকে এঁটে উঠতে পারছিলেন না তখন তিনি গার্গীর মুখ এই বলে বন্ধ করে দেন; সাবধান গার্গী! আর বেশী বললে তোমার মাথা খসে পড়বে।''[১৫]

পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর অবস্থা ভালো ছিল না। এ সময় ক্রমে সমাজে শূদ্র এবং নারীর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। নারীকে বলা হত 'ভার্যা' অর্থাৎ ভরণীয়া বা যাকে ভরণ করতে হয়। তার স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। শিশুকালে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বৃদ্ধাকালে বা বৈধব্যে পুত্রের অধীন।

> ''পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
>
> রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রযমর্হতি।।
>
> রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিত্রাং পতিঃ পুত্রাস্তুবার্ধকে।''[১৬]

পুরুষের মধ্যে ছিল বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন। কিন্তু নারীর বেলায় তার ঠিক উল্টো দিকটা ছিল। স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে হবে। অথর্ব বেদে নারীদের বহুবিবাহের কথা আছে। ঋকবৈদিক যুগে বিবাহ নারীর পক্ষে বাধ্যতা মূলক না হলেও পরবর্তীকালে তা হয়েছিল। এই সময়ে সমাজের বুকে সতীদাহ প্রথা ছিল না। বিধবা বিবাহ এসময়ে চালু ছিল, তা সে তার দেবরের সঙ্গে বা অন্য কারও সঙ্গেই হোক। অথর্ব বেদের যুগে নারীর জীবনে নেমে আসে ভয়ানক সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা। এ সময়ে বিবাহে কন্যাপণের কথা জানা যায়। ঋকবৈদিক যুগে নারী গৃহে আবদ্ধ থাকেনি। সে সময়ের অনেক নারী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। যেমন মুদগলিনী, বিশপলা, শশিয়সী প্রমুখ নারী। পরে অবশ্য নারী ক্রমশ পুরুষের অধীনে এবং অন্তঃপুরে বন্দী হয়ে পড়ে। তাদের কাজ হয়ে দাঁড়ায় শুধুমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার কারখানা ঘরে। যদি কোন নারী একের পর এক কন্যা সন্তান জন্ম দেন এবং কোন নারী যদি নিঃসন্তান থাকে তবে তার স্বামী অনায়াসে তাকে পরিত্যাগ করতে পারবে। আর স্বামী নিজের মত করে আবার বিয়েও করতে পারবে। নারী যদি কোন যৌন অপরাধে জড়িয়ে

পড়ে তাহলে তার ক্ষমা পাওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। আর পুরুষের বেলায় তা ক্রমান্বয়ে প্রশয় পেত। নারীর মন বলে কিছু নেই। নারীকে যেমন খুশি তেমন করে ভোগ করা ছাড়া আর তার কোন নিজস্ব অধিকার ছিল না। এক কাথয় প্রাচীনকালে নারীর কোন স্বাধীনতা নেই। নারীরা পুরোপুরি পুরুষের অধীন এবং পুরুষের সম্পত্তি, তাকে যেমন খুশি তেমন করে ব্যবহার করবে, প্রয়োজন পড়লে বিক্রি করে দিবে। নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে নারী ও শূদ্রেরা ছিল সমান। প্রাচীনকালে নারী ও শুদ্রেরা একই আসনে অধিষ্ঠিতা। ''শূদ্ররাই ছিল দাস ও সেই জন্য এখানেও নারী ও শূদ্রের জন্য একই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।''[১৭] গীতাতেও নারী, শূদ্র এবং বৈশ্যকে একই শ্রেণীতে রাখা হয়েছে।

> ''কৃষ্ণ বলেছেন, ''হে পার্থ, যারা পাপযোনি (অর্থাৎ) নারী, বৈশ্য, শূদ্র, তারা আমার শরণাগত হলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। নিঃসন্দেহে তিনজনই পরমগতি প্রাপ্ত হবার আশ্বাস পায় কিন্তু 'পাপযোনি' আখ্যা দেওয়ার অর্থ তৎকালীন সমাজ তাদের ঘৃণার চোখে দেখত।''[১৮]

গীতায় বলা হল-

''মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিতা যে'পি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্বাস্তথা শূদ্রাস্তে'পি যান্তি পরাং গতিম্।।''[১৯]

ধর্মশাস্ত্র বলি আর পুরাণ বলি নারীর প্রতি এ রকম হাজার হাজার ঘৃণার বাণ নিক্ষেপ হয়েছে। নারী ও শূদ্র ছিল সেকালের সমাজে অপবিত্র। আমরা জানি দ্বিজ এবং নারী ও শুদ্রের পবিত্রতা সাধারণত দু'প্রকারের হত। দ্বিজের শারীরিক শুচিতা যেখানে তিনবার আচমনে অর্জিত হত, সেখানে নারী এবং শূদ্রের বেলায় একবার মাত্র জলস্পর্শ করলেই যথেষ্ট ছিল। নারী ও শুদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করলে সাতদিন ধরে যবের তৈরি মণ্ড পান করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। নারী ও শূদ্র ছিল বিশ্বাসঘাতক এবং কৃতঘ্ন। ধর্ম প্রসঙ্গে এদের স্থান ছিল একই রকমের। মন্ত্রোচ্চারণে এবং পিণ্ডদানে নারী ও শূদ্রের কোন অধিকার ছিল না। যদি এই ধরনের কোন কাজ করতে হত তাহলে তাদেরকে অমাবস্যার তমসাঘনান্ধকারে করতে হত। নারী ও শূদ্রেরা বৈদিক নিয়মানুযায়ী স্নান করতে পারত না। ব্রাহ্মণের অনুশাসনে নারী ও শূদ্র অগ্নিযজ্ঞের অধিকারী ছিল না। নারী বা শূদ্র শিবলিঙ্গের পূজা করতে পারত না। এমনও বিধান পাওয়া যায়, প্রব্রজ্যা শিক্ষা দেওয়ার সময়ে শিক্ষক নারী, শূদ্র, সারমেয় ও কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী যেন না দেখে, তাহলে যে সবই অসত্য। কারণ এরা সকলে অসত্যের মধ্যে পড়ে।

বৈদিক যুগে নারী ছিল অশুচি। পাপিষ্ঠা। অমঙ্গলের কারণ। তাই-

> ‘‘নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণ মানুষ কখনো চিরদিন মানে না। যে-বঞ্চনা করতে পুরুষ এত আটঘাট বেঁধেছিল সে-বঞ্চনা শেষ পর্যন্ত তাকেও বঞ্চিত করেছে। আর, যে পরিমাণে নারী সে-বঞ্চনাকে নিজের মধ্যে নিষ্প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে সে পরিমাণে সেও তার স্বরচিত শৃঙ্খলে বন্দিনী। বৈদিক ভারতবর্ষে নারীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোনো স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না, তবে তাদের উত্তরপুরুষেরা এখন স্বীকার করে সে-কথা; বলে, নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকারসচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিতা বন্দিনীই ছিল। এতে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, অতীতকে যথার্থভাবে না দেখতে পাওয়ার জন্যে অতীতের যে বিষ বর্তমান সমাজদেহে সঞ্চারিত, তাকে চিনতে, তার প্রতিষেধ করতে এবং সুস্থ এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি-বিধান করতে অনাবশ্যক দেরি হয়ে যায়।’’[২০]

সে যাই হোক ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’, ‘বৌধায়ন সূত্র’, ‘কূর্মপুরাণ’ ‘সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র’, ‘বৃহৎসংহিতা’, ‘বিষ্ণুস্মৃতি’, ‘মার্কণ্ডেয়পুরাণ’, ‘মনুস্মৃতি’, ‘শুক্রনীতিসার’, ‘বৃহন্নারদীয়পুরাণ’ ইত্যাদি যেকোন গ্রন্থের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিনা কেন প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্যেই নারীদের হীনদশার প্রমুখ বর্ণনা দেখতে পাই। ধর্মশাস্ত্র গুলিতে নারী এবং শূদ্রকে আজীবনের দাস বলা হয়েছে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে নারী কখনো স্বতন্ত্র হয় না। নারীর কোন স্বাধীনতা নেই। নারী ও শুদ্র এরা একে অপরের পরিপূরক। মনুর মতানুসারে প্রভু মুক্তি দিলেও শূদ্র দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়না কারণ দাসত্বের অবস্থা তার যে জন্মগত। তাই

> ‘‘নারী ও শূদ্র উভয়েরই দাসত্ব যেহেতু জীবনভোর, সেজন্য এটি স্বাভাবিক যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অনেক স্থানে তারা যৌথভাবে উল্লিখিত হয়েছে।’’[২১]

ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্যে যেসব পৌরাণিক কাহিনিতে মেয়েদের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় সব সাহিত্যেই নারী পুরুষের সম্পর্ককে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেই দেখানো হয়েছে। নারী সংক্রান্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনির উপকথার মধ্যে রয়েছে সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, রাম-সীতা। অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে রয়েছে দ্রৌপদী, গান্ধারী, অরুন্ধতী, অহল্যা। এই প্রত্যেক নারীকে তাদের স্বামীদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে মা-শিশুর উদাহরণ খুব কম পাওয়া যায়। কারণ ভারতীয়দের ধারণা ছিল বা আছে মা হল নারীত্ব গড়ে ওঠার একটি অপরিহার্য উপাদান। কৃষ্ণ-যশোদাকে নিয়ে কাহিনি থাকলেও এ কাহিনির প্রধান আকর্ষণ যশোদা নয় কৃষ্ণ।

আবার একটুখানি মা-সন্তানের সম্পর্কের কথা রয়েছে কর্ণ-কুন্তী কাহিনিতে। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, কেউই এই কাহিনিকে খুব ভালোভাবে বিকশিত করেননি। তাই-

> ''মহাভারতের একটি গৌণ ও গুরুত্বহীন অংশ হিসাবেই তা থেকে গিয়েছিল। মা ও মেয়েকে নিয়ে বলার মত ঘটনার দেখা মেলে না। তাই এসব কিছুর ফলে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয় যে, নারীর সর্বোচ্চ বাসনা হল স্বামীকে জীবন্ত ভগবান রূপে সেবা করা এবং নিজে পতিব্রতা থাকা।''[২২]

পুরাণ কাহিনির মূল বিষয় হল মেয়েরা সতী এবং বিশ্বাসী হবে। সতীত্ব ও পতিব্রতার বিশেষ ক্ষমতাবলে তাদের নিজ নিজ স্বামী আত্মীয় পরিজনকে রক্ষা করবে এবং করেছে। অনেকে মনে করেন বৈদিকে যুগে, আর্য সমাজে নারীদের বিশেষ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সামাজিক হিসেবে নারীরা চালিত হত স্বামীর দ্বারা, এবং

> ''পরিবারের মধ্যে, যাগযজ্ঞে, উৎসবাদিতে নারীর একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। গৃহে তিনি 'পত্নী' অর্থাৎ স্বামিনী। বিবাহকালে তিনি শ্বশুর দেবর প্রভৃতি পরিজনের কাছে 'সম্রাজ্ঞী' হউন ইহাই ছিল প্রার্থিত।''[২৩]

ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর বিশ্লেষণে এও বলেছেন-

> ''যখন ভারতে আর্যেরা আসেন তখন তাঁহাদের নারীর সংখ্যা কম ছিল। এ দেশে আসিয়া তাঁহারা আর্যেতর জাতির কন্যাদের বিবাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কন্যা সুলভ হইল। অনেক কন্যার, বিশেষ করিয়া কুরূপা ও ভ্রাতৃহীনা কন্যাদের, বিবাহ হওয়া কঠিন হইল। ক্রমেই নারীর মহত্ত্ব কমিতে লাগিল।''[২৪]

এই সময় থেকে নারীকে শূদ্রার সমতুল্য জ্ঞান করা হয়েছে। কারণ ব্রাহ্মণদের গৌরববৃদ্ধির ফলে নারীকে তাঁরা নিজের সংজ্ঞায় ভূষিত করেছেন। আর্যরা এদেশে আসার পর থেকে শূদ্র নারীকে যখন তারা বিবাহ করতে শুরু করেছে, তখন ব্রাহ্মণ বাদীরা সব নারীকেই শূদ্র বলে মনে করেছেন। এই নারীরাই বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন কিন্তু এইসময় বিশেষ করে মৈত্রায়ণী-সংহিতার কালে

> ''নারীরা ঝুঠা, নারীরা দুর্ভাগ্য; সুরা, জুয়াখেলার মত তাহারাও নেশামাত্র (১.১০.১১, ৩.৬.৩)।''[২৫]

নারী তারা যতই ভালো হোক না কেন তবু নারী অধম পুরুষের থেকেও নিকৃষ্ট। যার প্রতিফলন আমাদের প্রবাদে ফুটে ওঠে- 'সোনার আংটি (পুরুষ) যতই বাঁকা হোক না কেন, তবু সে সোনা।' কি করে সনাতন ধর্মগ্রন্থে এই ধরনের কথা বলে থাকে। ভাবতে গেলেও অবাক লাগে। নারী তো পতির অর্ধাঙ্গ। নারীর নিন্দার কথা যে এখানে বলা হয়েছে তা নয়,

> ''তবে মোটের উপর বেদের আদিযুগে আর্য-নারীদের অবস্থা ভালোই ছিল। ক্রমে কিন্তু নারীদের স্থান একটু-একটু করিয়া নামিতে আরম্ভ হইল। এ দেশে আসিয়া সুলভ শূদ্রা-পত্নী গ্রহণই কি তাহার একমাত্র হেতু?''[২৬]

নারীরা শুধু মাত্র সন্তান উৎপাদন করবে। নারী মা হলে তার কর্তব্য বেড়ে যাবে, নারী আর ঘর থেকে বের হতে পারবে না। তাই পুরুষেরা যেমন খুশি তেমন করে তাকে ভোগ করে একেরপর এক সন্তান উৎপাদন করে যাবে। তা তো ভালো। তাই যদি হয় তাহলে কন্যা সন্তান জন্ম দিলে সে নারীকে কেন পরিত্যাগ করা হবে? তাকে তার ন্যায্যাধিকার থেকে কেন বঞ্চিত করা হবে। এর উত্তর কিন্তু ধর্মীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। করবেন ই বা কেন তাহলে তো আর নারীকে সম্ভোগ করা যাবেনা। পুরুষ তার পুরুষালি মনোভাবকে জিইয়ে রাখার জন্য এ ধরণের প্রথা চালিয়ে গেছেন। এক নারীতে পুরুষ তো সন্তুষ্ট নয়, তার তো যৌন ক্ষুধা নিবারণের জন্য হাজার হাজার নারী প্রয়োজন। ঐ পুরুষ যখন সে একেরপর এক তার পত্নী গর্ভে কন্যা সন্তানের জন্মের বীজ বোপন করেছে, এবং তারই পত্নী সেই বীর্য-বীজকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে যখন তাকে জন্ম দিয়েছে, তখনই তার কপালে নেমে এলো দুর্ভোগ। ঐ নারী তার ভূমিষ্ঠ সন্তানকে নিয়ে কোথায় যাবে? পিতৃ গৃহেও তো আর তার জায়গা নেই, কারণ সে কন্যা সন্তানের মা। তাই কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশে। চলতে চলতে ঠাঁই হল বেশ্যালয়ে। যে পুরুষ বা স্বামী দেবতা ঐ নারীকে পরিত্যাগ করেছে, সেই পুরুষ তার যৌন ক্ষুধা মিটাবার জন্য দেখা যায় ঐ বেশ্যালয়ের বেশ্যাটিকে অর্থাৎ তার নিজ পত্নীকে দিনের পর দিন সম্ভোগ করে চলেছে। এবং পত্নী যখন বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছে তখন তারই পরিত্যাগী কন্যা সন্তানকেও সম্ভোগ করেছে। না হলে এমনটি হবে কেন? পুরুষ তার কার্যসিদ্ধির জন্য গণিকালয় স্থাপন করেছে। কন্যা সন্তান জন্মদাত্রীদের তা না হলে কোথায় স্থান দিবে তারা? যদিও অনেকে মনে করেন-

> ''আর্যেরা সংখ্যায় অল্প, কাজেই সন্তান ও বংশ-রক্ষা আর্যদের একটা বড় কাম্য বস্তু ছিল। এই কারণেই কন্যার জন্ম অপেক্ষা পুত্রের জন্ম লোকে বেশি চাহিত। পুত্র যে পরম ব্যোমে জ্যোতির মত এবং কন্যা যে দুঃখের হেতু, তাহাও দেখা যায়।''[২৭]

তাই যদি হয় তাহলে প্রাজ্ঞ সমালোচকদের মতানুসারী আমি নই। এই কন্যা সন্তানটির কিবা অপরাধ যে তাকে জন্ম লগ্ন থেকে সমাজ বহির্ভুত হয়ে থাকতে হবে। থাকবে তো ঠিক কিন্তু কোথায়? এর ও তো সদুত্তর ধর্মগ্রন্থে মেলেনা। মিলবে কি করে, তার কারণ স্বরূপ তো বলেই দিলাম। ঐ নারী বা ঐ নারীরই গর্ভে জন্ম দেওয়া কন্যা সন্তানটিকে ঐ নারীর স্বামী বা কন্যা সন্তানটির পিতা তো তাকেই সম্ভোগ করবে দিনের পর দিন। নারীকে যেমন খুশি তেমন করে রাখ, সে কিছু বলবে না, যদিও বা কেউ বলতে গেছে তাকে তো আর পুরুষ সমাজ জিইয়ে রাখেনি, নাহলে দু'চারটে উদাহরণ হয়তো বা পুরাণ, বেদে, মনুসংহিতায় পাওয়া যেত।

পন্ডিতদের ধারণা অনুযায়ী বেদ রচনার সময়কাল ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আর উপনিষদের সময়কাল ৭০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কেউ কেউ মনে করেন

> ''উপনিষদের যুগ পর্যন্ত আর্যদের মাঝেও বিয়ের নিয়ম-কানুন পুরোপুরিভাবে গড়ে উঠেনি, এ প্রমাণ বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। তখন পর্যন্ত আর্যসমাজে নারীর পরিচিতি ও অধিকার পরবর্তী যুগের মত ছিল না। এমনকি, বহুচারিণী হওয়া নারীর জন্য ধর্মবিরোধী হওয়াতো দূরের কথা, সমাজে নিন্দনীয়ও ছিল না।''[২৮]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা জরুরী যে, ঐতরেয় উপনিষদের রচয়িতা ছিলেন ঐতরেয় মহীদাস। ঐতরেয় নামটি এসেছে তাঁর মা ইতরা থেকে। ইতরার স্বামী বিখ্যাত এক ঋষি। ইতরা তার স্বামীর সংশ্রব ছাড়াই গর্ভবতী হয়ে মহীদাসের জন্ম দেন। এ জন্য মহীদাস তাঁর মায়ের নামানুসারে ঐতরেয় মহীদাস হিসেবে পরিচিত। এই কাজের জন্য মহীদাস বা ইতরা কেউই সে সমাজে নিন্দনীয় ছিলেন না। আবার আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের জন্ম কথা জানতে পারি। সত্যকামের মা জাবালা বহু পুরুষের সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। সত্যকামের পিতৃ পরিচয় না থাকার জন্য মায়ের পরিচয়ে বড় হয়েছেন। এখানে আমরা নারী ব্যক্তিত্বের ক্ষীণস্বর শুনতে পাই। একে অনেকে ক্ষীণস্বর বললেও এর মধ্যে তৎকালিন নারীর অধিকারের সুপ্ত বীজ লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। শুধু তাই নয় নারী তার নিজ অধিকারকে আদায় করার মত অভীপ্সা জাবালার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। মায়ের পরিচয়ে বড় হওয়া সত্যকামের ঋষি হয়ে ওঠায় কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সে যুগে হয়নি কিন্তু আজ এ যুগে হয়। আবার বৃহদারণ্য উপনিষদের শেষ অধ্যায়ে আমরা ছত্রিশজন ঋষিকে খুঁজে পাই যারা মাতৃনামে বড় হয়ে উঠেছেন। যেমন পৌতিমাষীপুত্র, কাত্যায়নীপুত্র, গৌতমীপুত্র, ভারদ্বাজীপুত্র, পরাশরীপুত্র, কৌশকীপুত্র প্রমুখ। এর থেকে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে, উপনিষদের যুগ পর্যন্ত আর্য সমাজে বহুচারিণি মায়েরা

নিন্দনীয় ছিল না, এমনকি সন্তানকে মাতৃ পরিচয়ে পরিচিতি করাও সমাজ বিগর্হিত কাজ ছিল না। কোন সমালোচক মনে করেন-

> ''আর্য সমাজে নারীর উপর আরোপিত সমস্ত বাধা নিষেধ পরবর্তী ৪০০/৫০০ বছরের পরের ঘটনা। পিতৃতান্ত্রিক হলেও উপনিষদের কাল পর্যন্ত আর্যসমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার রেশ তখনো বেঁচে ছিল।''[২৯]

মহাকাব্য-রামায়ণে নারী: সারা বিশ্বে চারটি মহাকাব্যের মধ্যে ভারতীয়দের রয়েছে দুটি মহাকাব্য। এ দুটি হল রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণের চরিত্র থেকে মহাভারতের চরিত্রগুলি জটিল ও চিত্তাকর্ষক। 'রচনাকালের দিক থেক রামায়ণ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে রচিত। আর মহাভারতের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতক থেকে আরম্ভ হলেও এ রচনার সমাপ্তি হয় খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে। রামায়ণ পরে শুরু হয়ে আগে শেষ হয়। আর এরই জন্য রামায়ণ আদিকাব্য আখ্যায় ভূষিত হয়।[৩০] চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে কুন্তী ও দ্রৌপদী দৃঢ়চেতা রমণী হিসেবে খ্যাত। মহাভারতের মেয়েরা সতীও নয় নিষ্ক্রিয়ও নয়। সূর্য, যম, বায়ু এবং ইন্দ্রের সাথে বিবাহ-বহির্ভুত সম্পর্কের মাধ্যমে কুন্তী সন্তান ধারণ করেছেন।

> ''রামায়ণের ও মহাভারতের মূল কাহিনীদুটি সম্ভবত অনেক প্রাচীনকাল থেকেই গাথায়, আখ্যানে জনমানসে সঞ্চরণ করেছিল; ফলে মহাকাব্যদুটিতে ধর্মীয় ও সামজিক মূল্যবোধের দুটি চিত্র পাই; একটি মূল কাহিনীর আর একটি সংযোজিত বা প্রক্ষিপ্ত অভিপৌরাণিক অংশের।''[৩১]

আমরা এই দুটি মহাকাব্যে নারীর ধর্মীয় এবং সামাজিক অবস্থান কেমন ছিল তার কিছু কথা উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমেই আসা যাক রামায়ণের কথায়। রামায়ণ ভারতীয় আদর্শের কাঠামোতে সাজানো হয়েছে। তবুও একাব্যের প্রথমেই দেখি কৈকেয়ীর সাহসের কথা। কৈকেয়ীর সাহসী ব্যক্তিত্বে রাজা দশরথকে পূর্ব প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করতে পেরেছেন। লক্ষণ বনে গমন করলেও ঊর্মিলা তাঁর সঙ্গে না গিয়ে প্রাসাদেই থেকে গেছেন। এমনকি রাজা দশরথের মৃত্যুর পর রানীরা কেউই সতী হননি। তাঁরা বৈধব্যবেশ ধারণ করেছেন। সীতা রামায়ণের অবিসংবাদিত চরিত্র। সীতাকে ভারতীয় আদর্শ নারী হিসেবে অঙ্কন করেছেন কবিরা। সীতা ভূমিকন্যা। সীতা লাঙল চালনার ফলে ভূমি থেকে উৎপন্না। আবার তিনি রাজনন্দিনী। বিবাহের জন্য স্বয়ংবরা হয়ে সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ রাজপুরুষকে স্বামীরূপে বরণ করেছিলেন। স্বামী বিরহে এবং স্বামীকে একা বনে যেতে হবে জেনে সীতা তখনই রামচন্দ্রের সঙ্গে

বনে যেতে চায়। সীতা তো তৎকালিন পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। স্ত্রীকে যদি দূরে রেখে যায় তাহলে, রাম তো পর নারী সম্ভোগে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। এবং পরবর্তীকালে তিনি যখন ঘরে ফিরে আসবেন তখন সীতার প্রতি তাঁর মমত্ব নাও থাকতে পারে। এবং স্বামীর সঙ্গে চৌদ্দ বছরের জন্য বিরহে দিন কাটানোর চেয়ে স্বামীকে নিজের চোখে রাখা, স্বামীকে সেবা করা, তাঁর সুখে দুঃখে থাকতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে জেনে স্বামীর সঙ্গে বনবাসে পাড়ি জমালো। কারণ সীতা তো বুদ্ধিমতী রমণী। সীতা চরিত্রে এরপর নেমে এল নানা ঝঞ্ঝাট, বিপদ, অশান্তি। ফলস্বরূপ রাজনন্দিনী, রাজবধূ সীতা হয়ে উঠলেন অসুখী সংসারের তিতিবিরক্ত নারী।

রামায়ণের রামচন্দ্র কোমল-পেলব-নিষ্পাপ নিষ্ঠাবান রূপবতী জনক-নন্দিনী সীতাকে লাভ করেছিলেন। রামচন্দ্র চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়ে নিজেকে আদর্শ পুত্র বা আদর্শ ভ্রাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু আদর্শ স্বামীরূপে রামচন্দ্রকে সমাজের কোন জায়গায় ঠাঁই দেওয়া ঠিক নয়। বরং সীতাকে সমাজের সর্বোচ্চ আসনটি দেওয়া উচিত। কিন্তু তা সমাজপতিরা দিলেন না, তাঁদের পুরাষালি গর্বের কারনে। যদি সীতাকে এই আসনটি দেওয়া হত তাহলে তো আর পুরুষ রচিত কাব্যখানি মহাকাব্যের অভিধায় ভূষিত হত কিনা সন্দেহ থেকে যায়।

বাল্মীকি রামায়ণে নারীদের ছবি আঁকা হয়েছে আর্য ছকে। আর্যেতর নারীদের ছককে বাল্মীকি এড়িয়ে গেছেন। এ নারীরা আদিবাসী নারীদের মত নয়। আবার কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে সীতাকে বাঙালি আদর্শে অঙ্কন করছেন। বাঙালি ভাবাপ্লুত ভক্তিরসে সীতাকে এঁকেছেন। আবার এও বলা যায় সীতা-কাহিনি, দুঃখ পবিত্রতা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার কাহিনি। এই সীতাকে বাল্মীকি চিরজীবন্তময়ী করে রেখেছেন। সীতার আলেখ্য হিন্দুস্থানের তথা বাঙালির প্রতি গৃহে আজও সুশোভিত। অলক্ষিত কিংবা লক্ষিতভাবে

> ‘‘সীতার সতীত্ব হিন্দুস্থানের পত্নীকূলের মধ্যে অপূর্ব সতীত্ববুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। নূতন সভ্যতার স্রোতে নূতন বিলাসকলাময় চিত্র দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী ও অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহীন না হই। এস মাতা! তুমি সহস্র সহস্র বৎসর গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় হিন্দু গৃহে যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ তাহার পুনরুদ্দীপন কর, আবার ঘরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি ভারতবাসিনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈন্য; তুমি তাঁহাদিগের কঠোর সহিষ্ণুতায়, প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও পবিত্র আত্মসমর্পণের মধ্যে বিরাজ কর। তোমার সুকোমল অলক্তকরাগরঞ্জিত পাদযুগ্মের নূপুরমুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি

আমাদের প্রাপ্ত-তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি ভগবানের দান। আমাদিগের নানা দুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছায়া অলক্ষ্যে ভাসিয়া বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়া আমাদের স্বল্প খাদ্য ও ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তিকর হইয়া উঠে।''[৩২]

রামায়ণের রাজা দশরথের নারী লোলুপতার কথা তাঁর পুত্ররা জানত। এমনকি পুত্রবধূ সীতাও তা জানত। কিন্তু দশরথ যেসব নারীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছেন রাম তাদের মায়ের মত দেখেছেন। আবার এও ঠিক যে, যে সীতা রাজনন্দিনী, রাজকূলবধু যুদ্ধশেষে রামের কাছে সীতা এসেছে পায়ে হেঁটে। এই পায়ে হেঁটে আসার কথা বলেছেন স্বয়ং নরচন্দ্রমা রাম - যা আর্য সংস্কৃতিতে তো নয়ই অনার্য সংস্কৃতিতেও শিষ্ঠাচার বলে গণ্য নয়। আসলে সীতাকে অপমান করাই রামের একমাত্র লক্ষ্য, যার বিস্তৃত বর্ণনা পাই রামায়ণের মধ্যে। আরো দুঃখের বিষয় যখন দেখি সীতা যুদ্ধবিজয়ের পর রামের কাছে ফিরে এসেছে তখন রাম তার চরিত্রে সন্দেহ করেছে এবং সীতাকে রাম অগ্নিশুদ্ধা হতে বলায় সীতা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। যা রামায়ণের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি। লোক অপবাদের ভয়ে রামচন্দ্র সভাজনের সম্মুখেই সীতাকে বলেছেন-

''আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশমাস।।
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
তোমাহেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন।।
তোমারে লইতে পুনঃশঙ্কা হয় মনে।
যথাতথা যাও তুমি থাক অন্যস্থানে।।''[৩৩]

রামচন্দ্র সীতাকে থাকার জন্য দুটি স্থান নির্বাচন করে দিয়েছেন। একটি লঙ্কা, অপরটি অযোধ্যা। নিজ স্বামী-দেবতার কাছ থেকে একথা শোনার পর সীতার মাথায় যেন বজ্রাঘাত এসে পড়ল। তিনি বলেছেন আমি যদি তোমাকে উদ্ধার না করি তাহলে ত্রিভুবনে সকলে আমাকে ভীরু-কাপুরুষ বলবে, তাই আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি। এখন তুমি মুক্ত বিহঙ্গ, যেখানে ইচ্ছা তুমি সেখানে যেতে পার। রামচন্দ্রের একথা শোনার পর শুধু সীতা নন সভাজনেরা সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। সীতা এই বাক্যবাণ শোনার পর বলতে লাগলেন-

''ভাল মতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি।।
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাই করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে।।

সবে মাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ।।''[৩৪]

সীতাদেবী শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনিও সে যুগে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদিনী সুরে বলেছেন। এই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহলে কেন হনুমানকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যখন পাঠিয়েছিলে তখন একথাগুলো বলে দিলেই হত। তাহলে আমার এত কষ্ট সহ্য করতে হত না। হনুমানের মুখে একথা শুনেই তিনি হয় বিষপান করে নতুবা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মত্যাগ করতেন। রাম অনড়। লক্ষণকে তিনি বললেন অগ্নিকুন্ড সাজাতে। অগ্নিকুন্ড সেজে উঠল। অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হল। এরপর সীতাকে দিয়ে কবিরা রামচন্দ্রকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়ে দাউদাউ করা অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেওয়ালেন। অগ্নিকুন্ডে ঘৃতের কলসী ঢেলে দেওয়া হল। জ্বলন্ত অগ্নির লেলিহান শিখায় আর সীতাকে রামচন্দ্র দেখতে পেলেন না। সীতা বিহনে রামচন্দ্র সব কিছু শূন্য দেখতে লাগলেন। মাটিতে গড়াগড়ি করে বিলাপ করতে লাগলেন। এই বিলাপ দেখে দেবগণ, শমন, পবন, বরুণ, পুরন্দর, নল, নীল, সুগ্রীব, জাম্ববান, সুষেণ, অঙ্গদ সকলে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এই ক্রন্দন থেকে ব্রহ্মা দেব অগ্নিদেবকে আহ্বান করলেন। অগ্নিদেব এসে অগ্নিকুন্ড থেকে সীতাকে নিয়ে এলেন। সকলে দেখলেন-

''অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
যেমন তেমন আছে পট্টবস্ত্রখানি।।
মস্তকের পঞ্চফুল সেও না আত্তরে।
ষোড় হাতে রহিলেন রামের গোচরে।।''[৩৫]

দেবী সীতাকে রামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে দেবার সময় বললেন-'সীতার কোন পাপের কারণ' নেই। বরং সীতা দেবীকে স্পর্শ করে অগ্নিদেব ধন্য হয়েছেন বলে নিজেকে মনে করেন। অগ্নিদেব অদৃশ্য হবার আগে রামচন্দ্রকে সাবধান করে দিয়ে বলেন-

''বলি রাম সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রাজ্যদগ্ধ হইবে জানকী দিলে শাপ।।
যেই নারী শুনিবেক সীতার চরিত্র।
সর্বপাপ খণ্ডয়া সে হইবে পবিত্র।।''[৩৬]

সীতা অগ্নিশুদ্ধা হলেন সাক্ষী থাকলেন রাম এবং লক্ষ্মণ ও দেবতারা। এরপর রাম সীতা এলেন অযোধ্যায়। অগ্নিশুদ্ধা সীতাকে রাম পবিত্র বলে জানলেও অযোধ্যার বাসিন্দারা সীতাকে নিয়ে নানা

গুঞ্জন তুলতে লাগল। এই অভিযোগের মোকাবিলা রাম করতে পারতেন, তা না করে প্রজারঞ্জক রাম সীতাকে রাজসভায় দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে প্রজাদের সামনে নিজের শুচিতা প্রতিপালন করার আদেশ দেন। সীতা এই অগ্নিপরীক্ষা না দিয়ে তাঁর মাতা মাধবীর কোলে আশ্রয় নেন। আত্মাহুতি দেন। জনকনন্দিনী বুঝেছিলেন প্রজারঞ্জক রামের পুরুষ প্রজারা আবার যে কোন দিন তাঁকে সন্দেহ করতে পারে আবার তাকে শুচিতা প্রমাণ করতে হতে পারে। সারাজীবন ধরে যে, রামকে নিজের অধিক ভালোবেসেছেন তিনি তার কোনো প্রতিকার না করে বরং তাকেই আবার শুচি হবার জন্য অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে বলেছেন এর থেকে তো নিজেকে আত্মাহুতি দেওয়া ভাল। তাই সীতা নিজের জীবন বলিদান দিয়ে জন্মের মতো শুচিতা হয়েছেন। পবিত্রতা ও সতীত্বের ধারণা কাহিনির মধ্যে জিইয়ে রেখে সীতার যন্ত্রণা ও অপমানকে প্রায় প্রত্যেক কবিরা বাড়িয়ে তুলেছেন। 'রঘুবংশে' কালিদাস নারীত্বের এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

> ''তার প্রতি অত্যাচার হলে সে প্রত্যাঘাত করে না, আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে অবসান ঘটায় নিজের যন্ত্রণার। নিজের সন্তানদের জন্মের বৈধতা নিঃসংশয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সীতার পাতাল প্রবেশ প্রয়োজন ছিল; এমন এক ব্যাখ্যা সাম্প্রতিক কালে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কারণ আগেকার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পবিত্রতা নিয়ে অপবাদ দেবার মতো কুৎসিৎ মুখগুলো তখনও বন্ধ হয়নি। কি করে তিনি নিঃসংশয় হতে পারতেন যে আর একবার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে রামও তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি নন, তাই ধরণীর বুকে সীতার প্রবেশ রঘুবংশের ধারা যে নিষ্কলঙ্ক তা নিশ্চিত করল। যাই হোক না কেন, সীতার কাজ আত্মবিলোপ ছাড়া কিছুই নয়, আর বারবার অবমাননার শিকার হলে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করার মধ্য দিয়ে এর সমাধান করার চেষ্টা-নারীর এই পরিচয়ই এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল।''[৩৭]

রামায়ণের প্রতিটি অনুবাদ ভারতীয় আদর্শ রমণীর ছাঁচকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত হয়েছে। নারীর উপরে একেরপর এক-

> ''যদি অপমানের মাত্রা খুব বেশি হয়, তবে দুঃখের নিবৃত্তি ঘটতে পারে 'সম্মানজনক মৃত্যুর' মাধ্যমে, কিন্তু সম্মানজনক জীবন তার জন্য নয়।''[৩৮]

রামায়ণের জৈন সংস্করণ 'পদ্মপুরাণ' এর কাহিনি শেষ হয়েছে এভাবে-

> ''বনের মধ্যে রাম আবিষ্কার করলেন তাঁর সন্তানদের, পরিত্যাগের পর প্রথম দেখা হয় সীতার সঙ্গে। রাম সীতাকে আবার অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসতে বলেন। সীতা

এই অপমানজনক শর্তে রাজী না হয়ে প্রকৃতির সাহায্য প্রার্থনা করলেন। প্রকৃতি হাত বাড়িয়ে দিল। অলৌকিক এক বৃষ্টি ধারা নেমে এল পৃথিবীর বুকে। সমস্ত আগুন নিভে গেল, শুরু হল বন্যা-প্লাবন। অযোধ্যা ডুবে গেল, অযোধ্যাবাসী সীতার কাছে কাতর অনুনয় আবেদন করলেন তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। সীতা শেষ পর্যন্ত তাই করলেন। এখানে সীতা রামকে ও তাঁর পরিবারকে পরিত্যাগ করলেন। সীতা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করলেন। প্রকৃত জৈনের মতোই ভিক্ষুণীর জীবনে প্রবেশ করে সীতা তাঁর প্রত্যেকটি চুলকে উপড়ে ফেলে, কিন্তু হয়তো এই তীব্র শারীরিক যন্ত্রণাও রামের সাথে তার একসাথে থাকার অপমানের কষ্টের চেয়ে গ্রহণীয়।'[৩৯]

সীতা কাহিনির একটি লোকসংস্করণ আজও পাঠক মহলে বেশ চিত্তাকর্ষক। এই কাহিনিতে সীতাদেবি রামকে স্বীকার করেননি এমনকি তাঁর পুত্র লব-কুশদের মায়ের বংশধারাই মান্য করতে বলা হয়েছে। যখন বল্মীকি সীতাকে রামের কাছে ফিরে যেতে বলেছেন, তখন তীব্রভাবে সীতা তার পরতিবাদ করে বলেছেন-

''গুরুদেব আপনি তো সকল বিষয় সম্বন্ধেই অবহিত, তাহলে কেন আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আপনি কিছুই জানেন না?.....যে রাম আমার এত দুঃখের কারণ, যে আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে, গৃহ থেকে বহিষ্কার করেছে, আবার কি করে আমি তার মুখদর্শন করতে পার? আমিঅযোধ্যায় আর ফিরে যাবো না, নিয়তির প্রভাবে আর কখনো যেন আমাদের দেখা না হয়।''[৪০]

এরপর সীতা পাতালে প্রবেশ করেছেন। এই পাতালে প্রবেশ করা সীতার একদিকে যেমন প্রতিবাদ অন্যদিকে মর্যাদাসম্পন্ন জীবনের অধিকারের ঘোষণা।

প্রত্যেক কবিরা সীতার মুখে বাঁধা বুলি বসিয়েছেন। তবু মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে থেকে চাপা আবেগ বেড়িয়ে পড়েছে, তার গুরুত্ব অপরিসীম। এই আবেগময়ী তীব্র ধিক্কার আজকের রমণী-কুলের বিশেষ করে আধুনিক নারীদের প্রতিবাদী সত্ত্বার বংশপরম্পরায় সুপ্ত থাকা বীজ। সেই বীজ থেকেই যাকে আমরা নারীবাদী বলে আসছি তারও ভিত্তিমূল। উমা চক্রবর্তী সীতা কাহিনির বিকাশের যে উপসংহার টেনেছেন তাঁকে আমি সর্বাংশে মেনে নিয়ে তাঁরই মতকে এ 'রামায়ণে নারীর' উপসংহার শেষ করছি।-

''পুরান ও ইতিহাসে নারী-এই নিয়ে গবেষণা (Study) করতে পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গী পালটাতে হবে। রামায়ণের বিভিন্ন নিদর্শন বিশ্লেষণ করে আমি সীতার উপাখ্যান তুলে ধরেছি। নারীর পরিচয় যে পরিবর্তনশীল সামাজিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে এই

> উপাখ্যানের বিকাশকে দেখেছি। স্পষ্টত, কালের প্রবাহে নারীর সাগ্রিক ছবি আঁকার জন্য নতুন নতুন উপায়ে খুঁজে পাওয়ার জন্য নারী সংক্রান্ত গবেষণা করতে হবে।''[৪১]

পৌরাণিক কাহিনিতে অসংখ্য নারী চরিত্রের হদিশ মেলে। যেমন, দ্রৌপদীর মত প্রতিশোধপরায়ণী নারী, প্রমিলার মত যোদ্ধা, শকুন্তলার মত স্বয়ংবরা তেজী দুঃসাহসী রমণী। অথচ বাঙালি নারী তাদের আদর্শ হিসেবে কী জন্যে যে সীতা-সাবিত্রিকেই জীবনভর পূজা করে আসছে তা বোঝা দুস্কর। তাইতো প্রথিশযশা ঔপন্যাসিক বিমল কর তাঁর 'অসময়' উপন্যাসে কোন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

> ''সীতা সীতা করে এ দেশের মেয়েরা পাগল। নারীত্বের যা কিছু মহিমা সব যে সীতার সার্থক। এক সময় আমি ঠাট্টা করে বন্ধুদের বলতাম, তোমাদের মহাকবির বংশধররা খুব বিচক্ষণ লোক; বেচারা রামকে যতই ভাগাক সীতাকে একেবারে জড়োয়া সেট করে ফেলেছে হে। যত রকম দামি পাথর পেয়েছে সব ঠেসে দিয়েছে ঐ সেটে। আমার দেশের মেয়েরা বরাবরই অলঙ্কারলোভী; তারা ঐ অলঙ্কারটাই বেছে নিয়েছে।''[৪২]

মহাকাব্য-মহাভারতে নারী: এরপর আসা যাক মহাভারতের কথায়। এ কাহিনি মূলত দুই কুরুবংশীয় নৃপতিদের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কাহিনি। এ মহাকাব্যের নায়ক যুধিষ্ঠির আর খলনায়ক দুর্যোধন। কাহিনির ধারাবাহিকতায় দুর্যোধনাদি একশত ভ্রাতা বিজিত, তথা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, অন্যদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচভ্রাতা বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। অজস্র দুঃখ ও যন্ত্রণার কালিমালিপ্ত তমসাঘন পথ অতিক্রম করে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করেছেন।

> ''মনে প্রশ্ন জাগে, মহাভারতের কাহিনি যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত- তাহলে কেমন হ'ত? কাহিণি কাব্যের উপসংহার হিসাবে ধর্মপুত্রের ধর্ম সিংহাসনে আরোহণে পাঠক চিত্তে অতৃপ্তি বা ক্ষোভ থাকার তো কথা নয়। সুপরিচালিত ধর্মরাজ্য, পরিতৃপ্ত প্রজাপুঞ্জ। তবু মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপান্ডবের যাত্রার আয়োজন কেন?''[৪৩]

এরমধ্যে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু যা লক্ষ্য করেছেন তাকে আমি শিরোধার্য করে বলতে বাধ্য হচ্ছি-

> ''যে রাজ্য নিয়ে অতো বড়ো কুরুক্ষেত্র ঘটে গেলো, সে রাজ্য কি পান্ডবেরা ভোগ করেছিলেন? সব পেয়েও সব ছেড়ে গেলেন তাঁরা, বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের মহানির্জনে।.....'কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে নয়।'....পন্ডবের যুদ্ধে... ফলে অধিকার নেই, অধিকার শুধু কর্মে-আর তাই তার শেষ ফল চিত্তশুদ্ধি।''[৪৪]

এখানে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন তাও বলা আবশ্যক। মহাভারতের মহাপ্রস্থানের মধ্যে রয়েছে 'চিরপ্রার্থিত অপার্থিব পুরুষার্থ।'-

> ''অস্খলিত চরণে মহাপ্রস্থানের পথে চলিয়াছেন ভারতের রাজবৈরাগী পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। কত নিম্নে পড়িয়া আছে ভারতের রত্নসিংহাসন। অনুগমন করিয়াছিলেন-চির অনুগত চারিভ্রাতা-অনুগমন করিয়াছিলেন অনুরক্তা রাজেন্দ্রানী দ্রৌপদী। সকলেই ভূমিতলে পতিত হইয়াছেন। পথিকের কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নাই। চলিয়াছেন তিনি অভীষ্টের অভিমুখে যথায় আছে তাঁহার চিরপ্রার্থিত অপার্থিব পুরুষার্থ। ইহারই নাম বোধ হয় মহাভিনিষ্ক্রমণ।''[৪৫]

সংস্কৃত মহাভারতের মহাকাব্যের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। তবে এই সংস্কৃত মহাকাব্যের অমৃতবাণীকে যিনি বাঙালি মনের অনুকূলে প্রবাহিত করেছেন, তাঁর নাম কাশীরাম দাস। কাশীরাম দাসই বাঙালির হত-দরিদ্র পর্ণকুটীর থেকে ধনীর রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত এই কাব্যের রসধারাকে প্রবাহিত করেছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয় প্রমুখ কবিরা মহাভারতের কাব্যানুবাদে আত্মনিয়োগ করলেও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাস শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্ণ সিংহাসনটি তাঁরই প্রাপ্য। কাশীদাসী মহাভারত বাঙালি-ঘরের 'বেদ' ও 'গীতা' স্বরূপ। কাব্য মধ্যে যে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক কূটনৈতিকতার মতার্দশ রয়েছে তাকে কবি সহজভাবে দূরে রেখে বাঙালি-পারিবারিক ও সামাজিক উপাদানকে হৃদয়ার্তির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাশীদাসী মহাভারত সংস্কৃত কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বরং বলা ভাল এ কাব্যখানি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ছায়াবলম্বনে রচিত বাঙালির জীবন-চর্চা ও জীবন-চর্যার ধারানুসারী এক আশ্চর্য কাব্য-নির্মান কলা। চৈতন্যোত্তর যুগের ভক্তিভাবুকতার স্পর্শে সাক্ষর-নিরক্ষর বাঙালি পাঠক-শ্রোতাকে তাঁর কাব্য আঙিনায় নিয়ে এসছেন। শুধু এনেই ক্ষান্ত হননি কবি। কবি তাঁর কাব্য মধ্যে বাঙালি চরিত্রের এবং বাংলার মাটির কোমলতা ও ভক্তিভাবুকতা ধারণ করে তৈরি করেছেন এক অপরূপ রূপ-লাবণ্য। ফলে কাব্যের মহাকাব্যিকতা কিছুটা ক্ষুন্ন হলেও তাতে লেগেছে বাংলার শ্যামলতার স্পর্শ, কোমলতা ও সরসতার অনবদ্য রূপশ্রী। এ চরিত্রগুলো যেন বাংলার ধূলিমাখা মানবিকতার গুণে আমাদের ঘরোয়া মানুষ। কাশীদাস তাঁর চরিত্র গুলিকে সর্বভারতীয় মহাভারতের আদর্শে রূপান্তরিত করতে চাইলেও তা হয়ে উঠেছে বাঙালির রক্ত-মাংসের আদলে গড়া এক নব বাঙালি। ভারতকথার যে অর্ঘ্যের ডালি, তাকে কবি বীররস, করুণরস, ভক্তিরস, মধুররস, বাৎসল্য রস এবং হাস্যরসের বহুবিচিত্র উপাচারে সাজিয়ে তুলেছেন। কাশীদাস অমৃতসমান মহাভারতীয় কথার পুণ্যবান কবি।

মহাভারতীয় আখ্যানে প্রথমদিকে বংশধারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবাহিত হয়েছিল কোন না কোন রূপের বিধবা নিঃসন্তান ভ্রাতৃজায়ার মাধ্যমে। তবে মহাভারতীয় যুগে এই বংশধারাকে সমাজ

মেনে নিলেও জারজ সন্তানকে মেনে নেয়নি। তাই তো কর্ণকে মা কুন্তী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ কর্ণ গর্ভে আসার সময় পর্যন্ত কুন্তীর ছিল না কোন বৈধ স্বামী। এছাড়া, কর্ণের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কুন্তী তাঁর অন্য সন্তানদের কাছে কর্ণের পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর বৈধ সন্তানদের স্বার্থরক্ষার জন্য কুন্তী কর্ণকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

এই দুঃখকে সম্বল করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫-ই ফাল্গুন ১৩০৬ সালে রচনা করলেন 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' কাব্যনাটক। মহাভারতের কুন্তী অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কুন্তী বহুগুণে গুণান্বিতা। মহাভারতে কর্ণের থেকে পঞ্চপাণ্ডবদের রক্ষা করাই কুন্তীর কাছে শ্রেয়ধর্ম বলে পরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুন্তী পরিত্যক্ত সন্তানকে মাতৃক্রোড়ে ফিরে নেওয়ার জন্য বেশী আগ্রহশীলা। মা কুন্তীর মাতৃ-হৃদয়ের ঐশ্বর্য আজও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তাই তো কুন্তী বলছেন-

''পুত্র মোর, ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন- সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে-
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহ আপনার স্থান।''[৪৬]

এতদিন মা কুন্তী আত্মপরিচয় দিতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু মায়ের পরিত্যক্ত সন্তানের জন্য-

''অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনীর জ্বালাময় দংশন নিরন্তর অনুভব করিয়াছে, অলক্ষ্য হইতে এই হতভাগ্য সন্তানের নম্র ললাট নীরব স্নেহাশিসে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে।''[৪৭]

-এর জ্বলন্ত উক্তি দিতে কবি ভুলে যাননি।

''ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন - তবু হায়,
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার।''[৪৮]

কুন্তী তাঁর মাতৃধর্ম পালন করেননি। সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে সে সদ্যোজাত, অসহায় শিশুপত্রটিকে পরিত্যাগ করেছেন। মিথ্যা সমাজধর্ম বা সামাজিক আচারের কাছে মাতৃধর্ম বলি হয়েছে। তাই বিধাতার

বিচারে তাঁর বিদীর্ণ মাতৃবক্ষে আর তাঁর পরিত্যক্ত পুত্রকে ফিরে পাননি। ক্ষুদ্র শিশুই আজ মহীরুহে মহাবীররূপে তাঁরই গর্ভের অন্যান্য পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। কুন্তীর ধর্মভ্রষ্টতার জন্য আজ তাঁর এই পরিণতি বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন।

''হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব। সেইদিন কে জানিত, হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কী অভিশাপ!''[৪৯]

এ কবির কলমের স্পর্শে নারীর যে ব্যক্তি স্বাধীনতা তা ফুটে উঠেছে। মহাভারতের যে নারী সব থেকে বিতর্কিত তাকে আমরা সবার আলোচনায় নিয়ে আসছি। বিতর্কিত নারী হলেন দ্রৌপদী। দ্রৌপদী ভূমিকন্যা অবিসংবাদিত চরিত্র। দ্রৌপদী যজ্ঞাগ্নি সম্ভূতা। রাজনন্দিনী। বিবাহের জন্য স্বয়ংবরা হয়ে মহাভারতের সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ রাজপুরুষকে স্বামীরূপে বরণ করেছেন। বিবাহের পর দ্রৌপদী তেরো বছর অজ্ঞাতবাস করেছেন। এর ফলে দ্রৌপদীর জীবন হয়েছিল ঝঞ্ঝাটময়, বিপদে-ভরা ও শান্তির বাতাবরণ বলতে কিছুই ছিল না। এরই জন্য রাজবধূ, রাজনন্দিনী দ্রৌপদী হয়ে উঠেছিলেন অসুখী সংসারের তিতিবিরক্ত নারী।

দ্রৌপদীর পিতা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ বহু আকাঙ্খিত পুত্র লাভের আশায় যে যজ্ঞ করেছিলেন সেই যজ্ঞের অগ্নিসম্ভুতা কন্যা হলেন আদরিণী দ্রৌপদী। এই দ্রৌপদী নানা নামে খ্যাত। তিনি কখনো কৃষ্ণা, কখনো বিদেহী, কখনো পাঞ্চালী, কখনো বা যাজ্ঞসেনী। অতএব এ যুগের একমাত্র কন্যার মত সে যুগেও নাম নিয়ে কত আদিখ্যেতাই না হয়েছিল দ্রৌপদীর! আবার মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন পঞ্চপাণ্ডবের পক্ষে প্রধান সেনাপতির ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঠিক যেমন এখনকার সময় আদরের একমাত্র বিবাহিতা বোনের বিপদে আপদে ভগ্নীপতির পাশে এসে দাঁড়ান তাঁর ভ্রাতা। দ্রৌপদী ছিলেন বহুবল্লভা, নাথবতী অনাথবতী- পঞ্চপাণ্ডবের সম্পত্তি। এবং

> ''সম্ভবত এই কারণেই পাণ্ডবভ্রাতাদের মধ্যে একতা, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ কে দ্রৌপদী তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত এক সুতোয় গেঁথে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জন্য ই পাণ্ডবরা বুঝতে পেরেছিলেন যে একতাই বল।''[৫০]

দ্রৌপদীর গল্প চিত্তাকর্ষক, তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই কাহিনির মধ্যে আমরা দেখি, এক নারীর একাধিক ভাইকে পতি হিসেবে গ্রহণ ভারতীয় সমাজের প্রারম্ভিক যুগে স্বাভাবিক ছিল। ধ্রুপদী সাহিত্যকর্মের মধ্যে নারীচরিত্র হিসেবে দ্রৌপদীর ভূমিকা সর্বাধিক। পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্রৌপদীর রয়েছে সক্রিয় ভূমিকা। বারবারই দেখা কৌরবদের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদের প্ররোচিত করতে। দ্রৌপদী মুখ বুজে সব সহ্য করেননি, বরং আত্মসম্মানের জন্য পাণ্ডবদের তিরষ্কার করতে তিনি কখনও পিছুপা হননি। কৌরবদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছেন। আমরা জানি, কৌরবরা যখন তাঁর প্রতি অধিকারের দাবী করে রাজসভায় তাঁকে টেনে নিয়ে আসল, তখন রাজসভায় উপবিষ্ট বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সাথে একজন দাসীর আইনী অধিকার নিয়ে দ্রৌপদী বাদানুবাদ করেছিলেন এবং তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, যেহেতু তাকে বাজি রাখার আগেই যুধিষ্ঠির নিজেকে বাজিতে হারিয়েছেন, তাই যুধিষ্ঠিরের তার ওপর কোন অধিকারই থাকতে পারেনা। সুতরাং তাকে বাজি ধরাটাই আইনবিরুদ্ধ। কৌরবদের কাছে লাঞ্ছিত হয়েও তিনি পাণ্ডবদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করছেন এবং তাঁর লাঞ্ছনাকে সর্বক্ষণ মনে রাখার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যত দিন না তার অপমানের শোধ নেওয়া হবে ততদিন সে বেণী বাঁধবে না।

মহাভারতের চরিত্রগুলি বৈচিত্র্যে ভরপুর। আমাদের সমাজের মত সেখানেও ছিল একজন নায়কের সঙ্গে ছিল খলনায়ক। এখানে ছিল সমাজের সৎ-অসৎ, মূর্খ-জ্ঞানী, সুন্দর-অসুন্দর চরিত্রের চিত্রশালা। নানান চরিত্রের মধ্যে থেকে কবিরা খুঁজে বের করে নিয়েছেন একজন আদর্শ মানুষকে, একজন আদর্শ নারীকে এবং একজন আদর্শ খল নায়ককে। এদের মধ্যে দ্রৌপদীকে কোথায় স্থান দেওয়া যায়, সে বিষয়ে নানা মতানৈক্য রয়েছে। মহাভারতের দ্রৌপদী রূপকথার নায়িকা নন।

''দ্রৌপদী প্রেমে-ঈর্ষায়-প্রতিশোধপরায়ণতার ব্যঞ্জনাময় ব্যতিক্রমী নারী।

''কে তুমি সুন্দরী, যার বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে ভেসে যায়

পদ্ম হয়ে নদীর সচ্ছল স্রোতে অবিরল?

কোন পূত নিলীমায় লিপ্ত তুমি? কোন পুণ্যজল

তোমার লাবণ্যসার আপনার তরঙ্গে মেশায়?''

এই অবস্থা তো কবিরা সুকৌশলে দেখিয়েছেন যে, দ্রৌপদীর এই অবস্থা জন্মের আগে থেকে নির্দিষ্ট। আসলে নারীর ভাগ্য পুরুষের করতলে থেকেই যায়। পূর্বজন্মে যখন তিনি একজন স্বামীর অনুগ্রহ(!) পাচ্ছিলেন না তখন মহাদেবকে পূজা করতে গিয়ে পাঁচবার পতিং-দেহি বলার পর তিনি প্রতিবারই বর পান।''[৫১]

এরপর দ্রৌপদীর বিয়ের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়। বলা হয়ে থাকে এই রীতি নাকি পৌরাণিক যুগের নারীদের স্বাধীনতার চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এও ঠিক এই বিবাহে দ্রৌপদীর কতটা মত ও অমত ছিল তা কিন্তু কোন লেখক তেমন করে পাঠক সম্মুখে আনেননি। দ্রৌপদীর বিয়ে হল। বিয়ের পর কুন্তী নববধূকে আশীবাদ করার সময় বলেন- ''স্বাহা চৈব বিভাবসৌ....।''[৫২]

আজ ও কোন নববধূকে এই বলে আশীবাদ করা হয়। এই অদ্ভূত বিয়েতে দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ সকলে বহু উপহার পাঠান। অতঃপর দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী নিয়ে সহাবস্থান করেন। এই পঞ্চস্বামীকে নিয়ে যাতে কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়, তার জন্য নারদ ব্যবস্থা করে দেন। দ্রৌপদী এক বছর করে এক এক ভাইয়ের সঙ্গে সহবাস করবেন। আর এই সময় অন্যকোন ভাই এলে তাকে বারো বছর বনবাসী হতে হবে। দ্রৌপদী একবার যখন অর্জুনের কাছে যেতে বাধ্য হন, তখন তিনি ছিলেন যুধিষ্ঠির সঙ্গে; এমতাবস্থায় অর্জুন নিয়মানুসারে তীর্থযাত্রায় বের হয়ে যান। এ সময় তিনি সুভদ্রাকে বিয়ে করেন। এরমধ্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অর্জুন আবার দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এবং তৎকালীন সমাজে পুরুষের যে বহুবিবাহের অধিকার ছিল এ সম্পর্কে দ্বিমত থাকার কোন কারণ নেই। এই বিয়ের জন্য আজকের মত সে যুগের দ্রৌপদী বেশ অভিমান করেছিলেন। নারীর একাধিক বিয়ে সে তো পুরুষ-দেবতার নির্ধারিত বিষয় আর পুরুষের বেলায় তা তার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। পুরুষ যখন একাধিক বিয়ে করে তখন প্রত্যেকেই স্ত্রী বলে সেই পুরুষের অংশবিশেষ বলে বিবেচনা করে হয়ে থাকে। কিন্তু একজন নারীর ক্ষেত্রে এর ঠিক উল্টোটাই দেখা যায়। তাই-

> ''একাধিক স্ত্রী যদি অংশবিশেষ হয় তাহলে অনেক পুরুষের হাতে একজন নারী ক্রীড়নক পুতুল মাত্র বা তার চেয়ে খানিকটা অধিক মূল্যবান সম্পত্তি, যাকে অনায়াসে বাজি রেখে জুয়া খেলা যায়। যুধিষ্ঠির তাই দ্রৌপদীকে বাজি রেখে পাশা খেলেন এবং দুঃশাসনের কাছে হেরে যান। দুঃশাসন রাজসভার মধ্যেই দ্রৌপদীর শাড়ি খুলে ফেলে তাকে অপমান করার চেষ্টা করে। দেবতার সহায়তায় দ্রৌপদীর শাড়ি অন্তহীন হয়ে তাকে রক্ষা করেছিল।''[৫৩]

দ্রৌপদীর সারা জীবনে একটাই ভুল হয়েছিল। ময় দানব নির্মিত, স্ফটিক খচিত ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের প্রথম পদার্পণেই পা পিছলে যাওয়া দেখে হেসে ফেলেছিল। এই হাসিটাই তাঁর জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ালো। এর জন্য তাঁকে অনেক বেশি অপমান কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। যেখানে দেখি দুঃশাসন তাঁকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে তাঁর বস্ত্র ধরে টেনে এনেছিল রাজসভায় এবং সেখানে বিবস্ত্রা নারীর শরীরী বিভঙ্গ উপভোগ করেছিল একপাল মেরুদন্ডহীন পুরুষ।

এত মহাভারতীয় যুগ নয়। এত একেবারে আজকের যুগ, এ যুগে দাঁড়িয়ে নারীকে বিবস্ত্র করে মাথা মুড়িয়ে দিয়ে উলঙ্গ করে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে বেড়ানো হয়। যা আমরা মাল্টিমিডিয়ার এবং দৈনিক খবরের কাগজের পাতা খুললে হাজারো দেখতে পাই। সে যুগে কেন এ যুগেও আমরা দেখি যখন কোন নারীকে অনেক পুরুষের মাঝে শ্লীতাহানি করেছে, তার মাঝে কোন পুরুষের হয়তো দয়াবশে কিংবা বিবেকবোধে তাড়িত হয়ে তাকে বাঁচানোর জন্য ধেয়ে আসে ফলস্বরূপ তার কপালে নেমে আসে মৃত্যুসম বাণ। দ্রৌপদীর বেলাতে তাই হয়েছে। পুরুষ দেবতারা দেখলেন এই ঘটনা যদি ঘটানো হয় তাহলে তাদেরকে সকলে ঘৃণার চোখে দেখবে। ফলে অতি কৌশলে তাঁরা কবির কলমের ডগায় এসে অতিলৌকিকতার আশ্রয়ের বশীভূত হলেন। আর বেঁচে গেলেন দ্রৌপদী। দ্রৌপদী মুক্তি পেলেন। মুক্তি পাওয়ার পরই পাণ্ডবদের মুক্ত করে নেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে। শোনা যায়, দ্রৌপদীর বিশেষ মনোযোগ ছিল ভীমের প্রতি। তাই দেখা যায় স্বয়ংবর সভায় রাজাদের সঙ্গে পাণ্ডবদের দ্বন্দ্ব যখন ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠল তখন ভীমই সবার আগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর দ্রৌপদী এদিন প্রতিজ্ঞা করেন যেদিন, ভীম দুঃশাসনের রক্তমাখা হাতে তার চুল বেঁধে দিবে সেইদিন থেকে তিনি আবার চুল বাঁধবেন। কাপুরুষ পাণ্ডবদের মধ্যে ভীম একাই দ্রৌপদীর হয়ে প্রতিপক্ষ নির্মান করেছিলেন। আমরা আরও জানি বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণার ভাই কীচক দ্রৌপদীকে দেখে লুব্ধ হয়ে পড়ে। কোনোভাবেই তাকে আয়ত্ত করতে না পেরে প্রকাশ্য সভায় দ্রৌপদীকে অপমান করে সে। এবারও পাণ্ডবেরা বিরাটের ভয়ে নীরব থেকে যায়। এই নীরবতা দেখে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী নানাভাবে কটূক্তি করেন। এটা তাঁর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, যা পৌরাণিক যুগের নারীর প্রতিবাদী সত্তা বললে অত্যুক্তি হয়না। দ্রৌপদীর প্রতিহিংসা তখনও শেষ হয়নি। উপকীচকদের যেচে গিয়ে ডেকে দেখান প্রতিশোধের চেহারা। এ সময়ও দ্রৌপদী আক্রান্ত হন। আর মুক্ত করেন ভীম। ভীমের প্রণয়াবেগ বারংবার প্রকাশিত হয় তার কাজে, কিন্তু মুখ খুলে একবারের জন্যেও তিনি বলেননি, তাঁর প্রণয়াসক্তির কথাকে। বরং ভীম শেষ পর্যন্ত নীরব থেকে গেছেন। মহাভারতের শেষে দেখি পঞ্চপাণ্ডবসহ দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থানের সময় একমাত্র মহাবল ভীমসেনই দ্রৌপদীর পাশে ছিলেন এবং দ্রৌপদী যেন ভীমকেই পরজন্মে স্বামীরূপে পান; এইরূপ আশা নিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

মহাভারত থেকে জানা যায়, দ্রৌপদীর প্রকৃত পক্ষপাতিত্ব ছিল অর্জুনের প্রতি। তবু প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তিনি ভীমকেই অনুরোধ করতেন বারবার। তাই ভীমের আবেগ হয়তো অনুভব করতেন দ্রৌপদী। এভাবে দ্রৌপদীর বিয়ে আর বিবাহোত্তর প্রণয় রূপকথার মতো সরল থাকেনি আর। দ্রৌপদী

আধুনিক পাঠকের কাছে পৌরাণিক দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে রক্ত-মাংসের আমাদের চিরচেনা মানবীরূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

মুসলমান সমাজে নারী: বিশ্ব-বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি হচ্ছে নারী। মহাবিশ্বের সৃষ্টি লগ্ন থেকে নারীকে দেখা হয়েছে বস্তু হিসেবে, না হয় উন্নত পশু হিসেবে। মানুষ হিসেবে তাকে কোথাও কদর করা হয়নি। নারী শুধুই নারী। মানুষ নয়, নারী কী হয়ে জন্ম নিল সেটা বড় কথা নয় কিন্তু তাকে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয় নারী রূপে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ব-বরেণ্য কবি-সাহিত্যিক নারীকে বিধাতার পূর্ণ সৃষ্টিরূপ বলে মানতে চাননি। তিনি নারীকে দেখেছেন দয়িতা আর মানস-প্রতিমা অর্থ্যাৎ কাব্যলক্ষ্মী (পূর্ণ মানবী নয়) রূপে। নারীকে পুরুষের দল করেছে শৃঙ্খলিত, পড়িয়েছে হাতে বেড়ি। নারী তার পায়ের শৃঙ্খল, হাতের বেড়ি আজও মোচন করতে পারেনি। কারণ এযে বিধাতার নির্দেশিত আইন। নারীর কাছে পুরুষ হল দ্বিতীয় বিধাতা। পৃথিবী-স্বীকৃত ধর্মগুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম। হজরত মোহাম্মদ এর প্রতিষ্ঠাতা। এই ইসলাম ধর্মের ধর্মপুস্তক কোরান আল্লাহর ওহী। কোরানে কোন কিছু যুক্ত, বিযুক্ত কিংবা প্রক্ষিপ্ত করা সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস করেন মুসলমানেরা। কোরানে আলাদা ভাবে নারী সৃষ্টির কথা নেই। কনিষ্ঠতম ধর্ম-সন্তান নারীকে পৌছে দিয়েছে পৃথিবীর আদিমতম সমাজের বদ্ধ-জলাশয়ে। এখানে নারীর অবনমন চূড়ান্ত। প্রাচীন বিশ্বের সর্বত্র মনে করা হত নারীর সাথে উর্বরা প্রকৃতির কোনো প্রভেদ নেই। প্রকৃতির ক্ষেত্রকে কর্ষণ করলে যেমন শস্য উৎপাদন হয়, নারীকে মৈথুন করলেও তেমনি সন্তান-সন্ততি পাওয়া যায়। সন্তান জন্মানোতে নারীর কোনরকম কোন ভূমিকা নেই। যেমন নেই শস্যক্ষেত্রের। কর্ষণ করে বীজ বপন করলে শস্য আর মৈথুনের বীজ থেকে সন্তান। এই আয়াত নারীকে শুধু পদানতই করেনি, তাকে পরিণত করা হয়েছে পুরোপুরি যৌন কর্ষণের ক্ষেত্রভূমি রূপে।

ইসলামে নারী হল মূর্তিমতী কাম। যে নারী একদিন তাকে করেছিল স্বর্গভ্রষ্ট, লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে, তাই তাকে অর্থ্যাৎ নারীকে ইসলাম ক্ষমা করেনি কোনদিন। কোরানের চতুর্থ সুরা- 'সুরা নিসা'। 'নিসা' শব্দের অর্থ নারী। সুরার নামকরণ থেকে বোঝা যায় এখানে নারীর বিধি-বিধান-নির্দেশ-উপদেশ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে নারীর সম্পত্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যদিও তা যৎসামান্য। এই সুরা যদিও নারীর জন্য রচিত তবুও কিন্তু এখানেও কোরানের স্রষ্টা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে-

> ''পুরুষ নারীর রক্ষা কর্তা। কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষরা তাদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে।''[৫৪] (সুরা নিসা, ৪/৩৪)

আবার বলা হয়েছে-

> ''নারীদের পরিচালক হচ্ছে পুরুষরাই। কারণ, আল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যের উপরে মর্যাদা দান করেছেন।''[৫৫] (সুরা নিসা, ৬/৩৪)

ইসলাম ধর্ম পুরুষকে করেছে বহুভোগ্যা। সুরা নিসার প্রথমে আল্লাহ বলে দিলেন-

> ''তবে বিয়ে করবে (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চার জনকে। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকার ভুক্ত দাসীকে। এভাবেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভবনা বেশি।''[৫৬] (সুরা নিসা, ৪/৩)

এমনকি নারী অবাধ্য হলে তাকে প্রহার করার কথাও কোরানে বলা হয়েছে-

> ''স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে ভাল করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানায় যেওনা ও তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ খুঁজবে না।''[৫৭] (সুরা নিসা ৪/৩)

যদিও আবার অনেকে মনে করেন-

> ''১। ইসলামই প্রথম ঘোষণা করল, পুরুষের ন্যায় নারী জাতিরও আছে স্বাধীনতার অধিকার, মুক্তির অধিকার।
> ২। শিশু কন্যার আছে বাঁচার অধিকার।
> ৩। বিধবার আছে বিবাহ করার পূর্ণ অধিকার।
> ৪। কুমারীর আছে স্বামী পছন্দের সম অধিকার।
> ৫। পুরুষের ন্যায় মহিলারও আছে বিবাহবিচ্ছেদে সমান দাবী।
> ৬। নারীও এই পৃথিবীতে সম্পদের সমান অধিকার।
> ৭। পিতার, মাতার, স্বামীর, ভ্রাতার সকলেরই সম্পত্তিতে অধিকার।
> ৮। ন্যায় বিচারের অধিকার।

৯। আইনের সম অধিকার।

১০। পাপ ও পুণ্যের সম অধিকার।

১১। আরধনা ইবাদতে সম অধিকার।

১২। শিক্ষাতে সম অধিকার।

১৩। নারী মনুষ্য সমাজের অর্ধেক, তার দাবিও অর্ধেক।

১৪। এই পৃথিবীতে পুরুষের প্রয়োজন যতটা, নারীর দরকারও ততটাই।

১৫। একটি পরিবারের এক পা, এক হাত, এক চোখ, এক কান যুবকের, দ্বিতীয় গুলোর মালিক যুবতী।

১৬। ইসলাম ঘোষণা করল, এই পৃথিবীতের সমস্ত কিছুতেই নারীর প্রকৃতিগত, প্রবৃত্তিগত, স্বভাবগত, এবং যা কিছুই তার সহজাত, সর্বস্থানেই পুরুষের সঙ্গে তার সম অধিকার আছে।

১৭। সমগ্র মানবমন্ডলীর অর্ধাংশকে প্রথম মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিল কে, ইসলাম।

১৮। পুরুষের পুংলিঙ্গের নিকট নারীর স্ত্রী লিঙ্গ তো কোনদিনই লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কেবল প্রয়োজন-অপ্রয়োজন যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইসলামই তাকে সম-স্থান, সম-সম্মান দিল।''[৫৮]

আরব্য রজনীর অংসখ্য উপাখ্যানে দেখা যায় পুরুষ এক নারী থেকে অন্য নারীতে ছুটেছে, এক নারীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি- যাকে ইসলাম আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে। তাই ইসলামের কাছে বিয়ে একটা অসম চুক্তি, একটা প্রহসন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর জন্য একজন মুসলমান পুরুষ চারজন বৈধ স্ত্রী রাখার পরও যৌন সম্ভোগের জন্য যত খুশী দাসীকে সম্ভোগ করতে পারে, তাতে ইসলামী আইনে বা নৈতিকতায় কোন বাধা নেই। দাসী সম্ভোগ ইসলামে বৈধ। বিয়ে সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন-

''ইসলামি আইনে বিয়ের চুক্তি মালিক-শ্রমিকের চুক্তির থেকেও ভয়াবহ ও শোষণমূলক, কেননা ওখানে চুক্তি করে'ই একজনকে দেয়া হয় অশেষ অধিকার এবং আরেকজনের প্রায় সমস্ত অধিকার বাতিল হয় কিছু সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে। ইসলামি আইনে স্ত্রী হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ দাসী, যে স্বামীকে দেবে যৌনতৃপ্তি ও বৈধ সন্তান। কিন্তু স্বামী যখন ইচ্ছে মনের খেয়ালে শুধু তিনবার 'তালাক' বলে ছেড়ে দিতে পারবে তাকে। চুক্তির কথা বলা হলেও ইসলামি বিয়েতে পুরুষ ও নারীটি চুক্তিতে আসে না, চুক্তিতে আসে পুরুষ ও নারীর অভিভাবক।''[৫৯]

আবার তিনি বলেছেন-

> ‘‘..... ইসলামে বিয়ে যেহেতু চুক্তি, তাই তা চিরস্থায়ী নয়, যে-কোনো সময় স্বামী তা বাতিল করতে পারে। তালাক মুসলমান নারীর জীবনে সবচেয়ে ভয়ংকর শব্দ, ওই বজ্র যে- কোনো সময় নীলাকাশ থেকে তার মাথায় এসে ফাটতে পারে। মুসলমান পুরুষ চারটি বৈধ বিয়ে করতে পারে, পঞ্চম একটিও করতে পারে। পঞ্চম বিয়ে করলে বিয়েটি বাতিল হয় না, শুধু দরকার পড়ে আগের একটি স্ত্রীকে এক-দুই-তিন করে তালাক দেয়া। মুসলমান পুরুষের জন্যে তার চারটি স্ত্রী সম্ভোগই শুধু বৈধ নয়, সে তার ক্রীতদাসীদের সাথেও সঙ্গম করতে অধিকারী।’’[৬০]

ইসলামের সর্বশক্তিমান আল্লাহ পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামের জন্মলগ্নে নারীর যে স্বাধীনতা ছিল- তা কিন্তু পরবর্তীকালে আর থাকেনি। ইসলামের বিজয়রথ যতই এগিয়েছে পুরুষরা নারীর অধিকারকে করেছে পদানত, করেছে বন্দী আর পরিণত করেছে হারেমে। এর ফলে নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের কামনার বস্তু। হয়ে উঠেছে ফিৎনা- বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সময়ে নারীকে তারা বহন করেছে সাথে, কিন্তু তা একান্তভাবে উপভোগের জন্য। পুত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য আর দৈহিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। মুসলিম পুরুষের উত্তরাধিকার আরব পুরুষ যারা সম্ভোগ পরায়ন। পুরুষকে সংযত করার জন্যই কোরানে এত আয়াত এত সুরা, ‘‘ইসলামে নর-নারী:

যার যা আপন সহজাত গুণ
নারী নারীত্বেই উঠুক
পৌরুষ যার সহজাত ধন
পুরুষ পাহাড়ে চড়ুক।
সহজাত গুণ সহজাত ধন
স্রস্টার মহাদান
কারো হাতে যেন কভু নাহি হয়
তার কোনো অপমান।
*** *** ***
এক যদি হয় গরীয়ান তবে
অন্য সে গরীয়সী
এক যদি মহীয়ান তবে
অন্য সে মহীয়সী।

-কাব্যকানন ’’[৬১]

কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি বরঞ্চ একের পর এক নীতি-নৈতিকতার দায় নারীদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে গৃহশালায় বন্দী করে রেখেছে। তাহলে কি নারীর যোগ্যমূল্য ইসলাম দিয়েছে? উত্তরটি একবাক্যে দিলে, বলতে হয় না। এই না- এর কারণ হিসেবে বলতে হয় আল্লাহ পিতৃতন্ত্রের কঠোর বিধাতা। এই বিধাতা তো নিজের চোখে কালো পট্টি পড়তে পারে না আর পারবেও না। কারণ তা হলে তো হজরত মোহাম্মদ ৫১ বছর থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে পরপর ১২ জনকে (মতান্তরে ১০ জন) বিয়ের নামে প্রহসন করতে পারতেন না। এর জন্য এক কবি বলে উঠলেন-

''আমার বান্ধবী প্রভু বোরখা পড়ে না, মোরে কয়
যাঁরা তার হেজগার তারা কভু নারীর শরীর
কু'নজরে নয়, দেখে আল্লার শরিফ নয়নে
লুচ্চা ও লম্পট-যারা তারাই কেবলি বোরখার
অজুহাত তোলে। আল্লা দিক্ কালো কাপড়ের
পট্টি বেঁধে এইসব পুরুষের নাপাক নজরে।
তোমার মত কি? দেখো, বসে আছে দর্জী আর তাঁতী
তারাও সমানভাবে তোমার মতের উদ্গ্রীব
তাদের ব্যবসা ধান্দা, তারা আছে কাঁচি ও কাপড়ে
সেলাই মেশিন গুলো ফোঁড় দেবে তোমার নির্দেশে।''[৬২]

সবশেষে বলতে হয়, রামায়ণ, মহাভারত ও ইসলামীয় যুগে নারীদের দু'টি চিত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই নারী এবং শ্রমজীবী মানুষ বারংবার শোষিত হয়ে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রমিকরা আজ যতটা সচেতন হয়েছে নারী তার সিকি অংশও সচেতন নয়। এই শ্রমিকরাও নারীকে তাদের চেয়ে হীন মনে করে এসেছে, আজও করছে।

> ''শত শত বংশপরম্পরায় ধরে দাসত্ব করতে করতে দাসত্ব করা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। উভয়কেই এই দাসত্বের অবস্থাটাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে শেখায়। ফলে নারীরা তাদের এই পদানত অবস্থাটাকে এতই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয় যে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে তাদের বোঝাতে এবং তাদের মধ্যে সমাজে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতেও কম বেগ পেতে হয় না।''[৬৩]

ইতিহাসের গোড়া থেকে নারী ও শ্রমজীবী মানুষদের উপর যে শোষণ চলে আসছে তা নারীর বেলায় শতাংশের হিসেবে শত শতাংশে সত্য। মানবজাতির মধ্যে যারা প্রথম দাসত্বের বেড়ি পায়ে পরেছে তারা হল নারী। নারীরা পূর্বেও যা ছিল আজও তাই।

> ''অ্যামাজান রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব যদি ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে তা পুরুষের সম্পূর্ণ কড়াকড়ি ভাবে বাদ দিয়েই সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং বলা হয়ে থাকে যে সেইসব রাষ্ট্রের নারীরা তাদের যৌন কামনা চরিতার্থ করবার জন্য এবং সন্তান ধারন করে বংশ বিস্তার করবার জন্য বৎসরের কোনো কোনো দিনে আশেপাশের রাষ্ট্রের পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতো।''[৬৪]

এই আদিম যুগের নারীর দাসত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে, যা আজও বহমান। কিন্তু-

> ''ইতিহাসের যে সময়ে কেবলমাত্র শারীরিক শক্তিকেই মর্যাদা দেওয়া হতো এবং মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম যখন নিতান্তই পাশবিক এবং বর্বর আকারের ছিল, তখন নারীদের সন্তান ধারণের কারণে সেই সাময়িক অসহায়তার দরুনই তাদের উপর অনেক হিংস্র আক্রমণ হয়েছে, শিশু কন্যাদের হত্যা করা হয়েছে, নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচারও করা হয়েছে।''[৬৫]

এরপর একদিন নারীদের সংখ্যা কমে এল। ফলে পুরুষ সন্তানদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে উঠল, আর তার জন্যে এক নারীর বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা আবার চালু হল। মানুষের মধ্যে যখন ভাল অঞ্চলে বাসের জন্য আগ্রহ বেড়ে উঠল, তখন থেকে মানুষের মধ্যে চাষ-বাসের উৎপত্তি লক্ষ্য করা গেল।। যার ফলে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে নারী হল পুরুষের ভৃত্য; নারী শুধু সন্তান পালন এবং ঘর-কন্নার কাজ করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এরফলে নারীরা তার সংসার নিয়ে একেরপর এক বাসস্থান বদল করতে থাকল। এসময় থেকে শুরু হল চাষাবাদ। চাষাবাদের সময় লাঙল আবিষ্কার হল, নারীরাই ধরল প্রথম হাল। নারীরাই লাঙল টানার কাজ করে বেশি ফলন উৎপাদন করল।

> ''আরো যেখানে নারীরা সংখ্যালঘু ছিল, সেখানে সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য ছিল এবং ফলে পুরুষের বহু পত্নী গ্রহণের বদলে নারীর বহু পতি গ্রহণের প্রথার প্রচলন ছিল। বর্তমানে সিংহল (Ceylon) স্যান্ডুইচ (Sandwich) এবং মারকুইসাস দ্বীপে (Marquesas Isles) কঙ্গো এবং লোয়াঙ্গো (Congo and Loango) অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত আছে। অধিকন্তু, পেরুর ইনকাসদের (Inces in Peru) মধ্যে রাজকন্যাদের বহু পতি গ্রহণের নিয়ম আছে। যে সব গোষ্ঠীর মধ্যে নারীদের বহু পতি গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে স্বভাবতঃই দেখা

> যায় যে স্ত্রী সন্তানদের চেয়ে পুরুষ সন্তানদের সংখ্যা অনেক বেশি সুতরাং এক নারীর বহু স্বামী গ্রহণের পূর্ব প্রথা চলতেই থাকে।''[৬৬]

আমরা প্রাচীনকালে দেখি নারী ছিল পুরুষের প্রধান ভৃত্য; নারী শুধু সন্তান পালন এবং ঘরের কাজের সঙ্গে পরিধেয় প্রস্তুত, বাসের জন্য কুটির এবং চাষাবাদের জন্য নারী লাঙল টানবে। তবে নারীর একটা বিশেষ মূল্য ছিল। তাদের মনে করা হত বিনিময়ের সামগ্রী হিসেবে। এই বিনিময়ে পুরুষ পেত বেশ ভাল রকমের মূল্য।

> ''যাকে তার মালিকের কাছ থেকে অর্থাৎ তরুণী কন্যার পিতার কাছ থেকে দরকষাকষি করে পাওয়া যায় এবং তার পরিবর্তে পুরুষকে দিতে হয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী- গবাদি পশু, শিকারের সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র অথবা ক্ষেতের শস্য। আজও পর্যন্ত আমরা সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যে অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে কুমারী কন্যা বিনিময় করার প্রথা চলে আসতে দেখি। তার ফলে নারী হয়ে যায় পুরুষদের হাতের সম্পত্তি, পুরুষ তার ইচ্ছামতো তাকে রাখতে পারে বা ফেলতে পারে, দূর করে দিতে পারে, তার প্রতি দুর্ব্যবহার করতে পারে অথবা খুশিমতো তাকে রক্ষাও করতে পারে।''[৬৭]

নারীকে কীভাবে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা হত সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বোধহয় কেউ কোনদিন তেমন করে মাথা ঘামিয়েছেন কীনা সন্দেহ রয়ে যায়। সে সময় স্ত্রীকে কিনে নেওয়ার চেয়ে জোর করে নিয়ে যাওয়াটা অনেক বেশী সস্তা ছিল। আগস্ট বেলেল জানিয়েছেন-

> ''এখনো পর্যন্ত নারী ধর্ষণ ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসেবে চলে আসছে-যেমন সাউথ চিলির অরকানিয়ান ইন্ডিয়ানদের (Aracanian Indians) মধ্যে। বরের বন্ধুরা যখন কনের বাপের সঙ্গে দরকষাকষি করতে থাকে, তখন বর চুপি চুপি ঘোড়া নিয়ে বাড়ির কাছে এসে কনেকে ধরে নিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। তখন সেখানকার নারী পুরুষ শিশু সকলে মিলে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে। বর-কনে জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছে গেলেই বিয়ে হয়ে গেছে ধরে নেওয়া হয়। এমনকী এই কনে হরণের ব্যাপারটা মা-বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও সে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে ধরে নেওয়া হবে। এই পবিত্র বনভূমিই হলো বিবাহবাসর, এখানে প্রবেশ করলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।''[৬৮]

মানব সমাজের জন্মলগ্ন থেকেই নারী পুরুষের চেয়ে হীন অবস্থায় ছিল, ছিল পরাধীন। এ কথা স্বয়ং এঙ্গেলস মার্কসবাদের সূত্র ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন-

> "That woman was the slave of man at the commencement of society is one of the most absurd notions that have come down to us from the period of Enlightenment of the 18th Century." [৬৯]

যে কোন দেশের, যে কোন ধর্মের নারীর সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে প্রায় সমস্ত চিত্রটাই এক। হয়তো সামান্য কিছু ব্যতিক্রম নজরে আসে। কিন্তু নারীর নারী হওয়া, তাকে মানুষ না ভেবে 'পশু' করে রাখা কিংবা নারীর অধিকার, সামাজিক মূল্যবোধ বা অবস্থান, পুরুষের সঙ্গে সম-অধিকারের প্রশ্ন উঠলেই ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদেরকে সমাজের নীচুতলার বাসিন্দা করে রাখা হয়েছে। হিন্দু সমাজ বলি আর মুসলমান সমাজই বলি না কেন প্রত্যেক সমাজেই নারীকে হীন চোখে দেখা হয়েছে। নারীকে নারী করেই রাখা হয়েছে, মানুষ হতে দেয়নি। মানুষ তৈরীর আঁতুড় ঘরে যে শিক্ষা, অর্থনীতি- সব কিছু থেকে তাদেরকে করেছে বঞ্চিত। তাই বলতে দ্বিধা নেই এই যে নারী এবং পুরুষের সম্পর্ক তা গড়ে উঠেছে স্বাভাবিক প্রেমের তাগিদে নয়, সংসারের তথা সন্তান-উৎপাদনের প্রয়োজনের ভিত্তিতে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

০১। ইস্‌লাম, নজরুল: সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ঊনপঞ্চাশৎ সংস্করণ, পৌষ, ১৪০৪

০২। মুখোপাধ্যায়, কনক: বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২

০৩। দত্ত, চৈতালী: মনুসংহিতা, (সম্পাদনা ও ভাষান্তর) নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ-৪১৭

০৪। তদেব, পৃ-৪১৯

০৫। তদেব, পৃ-৪১৯

০৬। তদেব, পৃ-৩৬৯

০৭। তদেব, পৃ-৩৬৯

০৮। তদেব, পৃ-৩২২

০৯। তদেব, পৃ-৩২২

১০। তদেব, পৃ-৩৬৯

১১। তদেব, পৃ-৩৬৯

১২। তদেব, পৃ-৪০৯

১৩। ভট্টাচার্য, সুকুমারী: প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪১১, পৃঃ ২৯

১৪। তদেব, পৃঃ ২৯

১৫। চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী ও ভট্টাচার্য, প্রীতা: প্রাচীন ভারতে নারী, অবভাস, মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯, কলকাতা ৯

১৬। দত্ত, চৈতালী: মনুসংহিতা, (সম্পাদনা ও ভাষান্তর) নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ-৩৬৯

১৭। শর্মা, রামশরণ: প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ৬১

১৮। তদেব, পৃঃ ৬১

১৯। গীতা, নবম অধ্যায়, পৃঃ ৩২

২০। ভট্টাচার্য, সুকুমারী: প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪১১, পৃঃ ৪০

২১। শর্মা, রামশরণ: প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ৬৪

২২। চক্রবর্তী, উমা: প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্রাত্যজনের চোখে, অনুবাদ: অম্লান ভট্টাচার্য, সেতু-২০১১, পৃঃ ১৫০

২৩। সেন, ক্ষিতিমোহন: প্রাচীন ভারতে নারী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আষাঢ় ১৩৫৭, পৃঃ- ৫২

২৪। তদেব, পৃঃ- ৫২

২৫। তদেব, পৃঃ- ৫২

২৬। তদেব, পৃঃ- ৫৩

২৭। তদেব, পৃঃ- ৫৩

২৮। রহমান, মোঃ শহীদুর: আদি বাংলার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা-১২০৯, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০১২, পৃঃ-৩২৯

২৯। রহমান, মোঃ শহীদুর: আদি বাংলার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা-১২০৯, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০১২, পৃঃ-৩২৯

৩০। ভট্টাচার্য, সুকুমারী: প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪১১, পৃঃ ১০০

৩১। তদেব, পৃঃ ১০০

৩২। দীনেশচন্দ্র সেন, রামায়ণী-কথা, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, পৌষ ১৩৮২, পৃঃ ৯৬-৯৭

৩৩। প্রামানিক, মলয়: রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত, সম্পাদনা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা- ২০০৭, ভূমিকা অংশ, পৃঃ- পৃঃ- ২১৮

৩৪। তদেব, পৃঃ- ২১৮

৩৫। তদেব, পৃঃ- ২২০

৩৬। তদেব, পৃঃ- ২২১

৩৭। চক্রবর্তী, উমা: প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্রাত্যজনের চোখে, অনুবাদ: অম্লান ভট্টাচার্য, সেতু-২০১১, পৃঃ- ১৫৬

৩৮। তদেব, পৃঃ- ১৫৬

৩৯। তদেব, পৃঃ- ১৫৮,সীতার কাহিনীর বিকাশ, পৃ-২০২, Padma Purana, পৃ-৬০৯-১০

৪০। তদেব, পৃঃ- ১৫৮, সীতার কাহিনীর বিকাশ, পৃ-২০২, Sita Who Refused the Fire Ordeal, পৃ-১৯

৪১। চক্রবর্তী, উমা: প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্রাত্যজনের চোখে, অনুবাদ: অম্লান ভট্টাচার্য, সেতু-২০১১, পৃঃ- ১৫৭

৪২। অসময়, বিমল কর পৃ-৩৫

৪৩। ঘোষ, প্রভাতকুমার: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাৎসল্য রস- পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯, এপ্রিল ২০০৭, পৃঃ ৮৭

৪৪। বসু, বুদ্ধদেব: প্রবন্ধ সংকলন, রামায়ণ, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, পৃঃ ১২৫

৪৫। মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ: গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃঃ ২২৪

৪৬। ঘোষ, অজিতকুমার: রবীন্দ্র নাট্যরচনাবলী, (সম্পাদনা) কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, জানুয়ারী ২০০৫, পৃ-৫৭৯

৪৭। ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা-০৭,পৃঃ-১০৬

৪৮। ঘোষ, অজিতকুমার: রবীন্দ্র নাট্যরচনাবলী, (সম্পাদনা) কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, জানুয়ারী ২০০৫, পৃ-৫৮১

৪৯। তদেব, পৃ-৫৮২

৫০। মুখার্জী, ইন্দিরা: দ্রৌপদী এবং সীতা-- দুই বিতর্কিত নারী চরিত্র, labeis; draupadi, sita http;//sonartoree.blogspot.in/2008/05/blog-post 07.html

৫১। চৌধুরী, রোখসানা: নারীবাদী সমালোচনায় পৌরাণিক চরিত্ররা- www.kalerkantho.com/print_news.php?pub_no...তাং ২৪-৪-২০১৩

৫২। তদেব, তাং ২৪-৪-২০১৩

৫৩। তদেব, তাং ২৪-৪-২০১৩

৫৪। হবিবুল্লাহ মনসুর, 'মুসলিম নারীর অধিকার প্রসঙ্গে' ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পৃ-১৫

৫৫। তদেব, পৃ-১৬

৫৬। তদেব, পৃ-১৭

৫৭। তদেব, পৃ-১৭

৫৮। গনী, ড. ওসমান: ইসলাম ও নারীসমাজ, প্রথম খন্ড, অবতরণিকা, বুকস্ওয়ে, দ্বাদশ প্রকাশ, মার্চ ২০১০, পৃ- ৯৬-৯৭

৫৯। আজাদ, হুমায়ুন: নারী, আগামী প্রকাশনী, ২০০০, ৩৬, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ- ৭৬

৬০। তদেব পৃ- ৭৭

৬১। গনী, ড. ওসমান: ইসলাম ও নারীসমাজ, প্রথম খন্ড, অবতরণিকা, বুকস্ওয়ে, দ্বাদশ প্রকাশ, মার্চ ২০১০ পৃ- ২৫-২৬

৬২। বোরখা, এবাদতনামা: ৩৫- ফরহাদ মজহার https://www.facebook.com/shahbagecyberjuddho/posts/592902290752592

৬৩। বেবেল, আগস্ট: নারী অতীত-বর্তমান ভবিষ্যতে, অনুবাদক, কনক মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই ২০১২, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ০১

৬৪। তদেব পৃঃ ০২

৬৫। তদেব পৃঃ ০২

৬৬। তদেব পৃঃ ০৪

৬৭। তদেব পৃঃ ০২

৬৮। তদেব পৃঃ ০৭

৬৯। https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/origin_family.pdf -